জাতীয় ভিত্তি

(পল্লী-সংস্কার সমস্যার আলোচনা)

অধ্যাপক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-লিখিত ভূমিকা সহ)

প্রকাশক—প্রফুল্ল রায়
পি ৪৯, লেক্ রোড, কলিকাতা।
১৩৩৮

প্রিণ্টার—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত,
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড্,
১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

मनः पूर्ब्बामाधर्मा मनः श्रेष्टा मनोमयाः ।

—बुद्धदेव ।

"Mind takes the lead of the world; mind excels the whole world; the world is a creation of mind."

—Buddha.

"আজ আমাদের দেশে জল নাই বলিয়া যে আমরা আক্ষেপ করিতেছি, সেটা সামান্য কথা। সকলের চেয়ে গুরুতর শোকের বিষয় হইয়াছে—তাহার মূল কারণটা। আজ সমাজের মনটা সমাজের মধ্যে নাই; আমাদের সমস্ত মনোযোগ বাহিরের দিকে গিয়াছে।

কোনো নদী যে গ্রামের পার্শ্ব দিয়া বরাবর বহিয়া আসিয়াছে, সে যদি এক দিন সে গ্রামকে ছাড়িয়া অন্যত্র তাহার স্রোতের পথ লইয়া যায়, তবে সে গ্রামের জল নষ্ট হয়, ফল নষ্ট হয়, স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, বাণিজ্য নষ্ট হয়; তাহার বাগান জঙ্গল হইয়া পড়ে, তাহার পূর্ব্ব-সমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষ আপন জীর্ণ ভিত্তির ফাটলে ফাটলে বট-অশ্বত্থকে প্রশ্রয় দিয়া পেচক-বাদুড়ের বিহার-স্থল হইয়া উঠে।

মানুষের চিত্তস্রোত নদীর চেয়ে সামান্য জিনিষ নহে। সেই চিত্তপ্রবাহ চিরকাল বাংলার ছায়াশীতল গ্রামগুলিকে অনাময় ও আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছিল—এখন বাংলার সেই পল্লীক্রোড় হইতে বাঙ্গালীর চিত্তধারা বিক্ষিপ্ত হইয়া গেছে। তাই তাহার দেবালয় জীর্ণপ্রায়—সংস্কার করিয়া দিবার কেহ নাই; তাহার জলাশয়গুলি দূষিত—পঙ্কোদ্ধার করিবার কেহ নাই; সমৃদ্ধ ঘরের অট্টালিকাগুলি পরিত্যক্ত—সেখানে উৎসবের আনন্দধ্বনি উঠে না।"

—রবীন্দ্রনাথ

নিবেদন

রাষ্ট্রীয় ইমারতের নক্‌সা নিয়ে দেশ-নেতারা আজ যখন লণ্ডনে গোল-টেবিলের বৈঠকে বসে গেছেন, এমন সময় ভিত্তির কথাটা তোলা অপ্রাসঙ্গিক বলে' মনে হ'তে পারে। পার্লামেণ্ট শাসন তন্ত্র আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এই হচ্চে রাষ্ট্রনীতির চরম আদর্শ; কিন্তু এর সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ খাপ্‌ খায় কিনা ও আমরা এই উপায়ে আমাদের স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তুল্‌তে পারব কিনা, এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় নি। মহাত্মা গান্ধিজী দাবী করছেন Poor man's democracy অর্থাৎ নিঃস্বদের অবস্থা ও ব্যবস্থা বুঝে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে সেই শাসনতন্ত্র; আর আমাদের শাসন-কর্ত্তারা ও তাদের অনুচরেরা বল্‌ছেন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার কাজকর্ম্মে জনসাধারণকে আহ্বান করার প্রকৃষ্ট পন্থা হচ্চে Ballot-box democracy, অর্থাৎ ভোট দেবার অধিকার বিলিয়ে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে' যে-শাসনতন্ত্রের জন্ম, তার প্রতিষ্ঠা করা। ইংরেজ-সমাজ ও সভ্যতা এর সঙ্গে সুপরিচিত; এই সমাজের ও সভ্যতার সম্মতিকে আশ্রয় করেই এই তন্ত্র দাঁড়িয়ে আছে। সেটা আমাদের বিশেষ অবস্থায় প্রযোজ্য হবে কিনা, তা' ভাব্‌বার কথা।

দেশটার অধিকাংশ লোক হয় কৃষিজীবি না হয় জমিজীবি। এদের মধ্যে বারো আনার সঙ্গতি অত্যন্ত অল্প। জমিজমার অধিকার, টাকাকড়ির দেনা-পাওনা প্রভৃতি নানা প্রকার অসাম্য অবস্থার ফেরে তার দুরবস্থা আর ঘোচে না। তারপর সামাজিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিশ্লিষ্টতা ও বিচ্ছিন্নতার নানা কারণ দেখা দিয়ে বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে। জনগণ ও মধ্যবিত্তের শিক্ষার তারতম্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং এই কারণে বহু প্রকার কৃত্রিম অসাম্য বিধিব্যবস্থা আমাদের সামাজিক জীবনের পরিণতির পক্ষে অন্তরায় হ'য়ে উঠেছে।

এমন অবস্থা ও ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে হবে গণতন্ত্র। কিন্তু গণতন্ত্রের মন্ত্র উচ্চারণ করলেই ত আর জনগণের দুর্গতি ঘুচ্‌বে না। ধনী, ব্যবসায়ী, শাসনকর্ত্তা ও তথাকথিত গণপ্রতিনিধি—এদের সকলের স্বার্থ জনসাধারণের স্বার্থকে অগ্রাহ্য করে এবং আশঙ্কা হয় প্রতিনিধিমূলক শাসন-তন্ত্রের দোহাই দিয়ে এরা তাদের স্বার্থ ও প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবার সুযোগ পাবে।

যে সব ব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের সমগ্র জীবনটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়ানো ছিল, বিদেশী শাসনের নেতৃত্বে তার পরিবর্ত্তে নানা রকম যান্ত্রিক ব্যবস্থা

প্রবর্ত্তিত হয়েছে। তারপর যে দিন থেকে আমাদের হাত থেকে দায়িত্বভার চলে গেল, তার সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীজীবনের উপাদানগুলিও হারাতে বসলুম। বিদেশী শাসনের বিধিব্যবস্থায় পল্লীসমাজের বাঁধন ভেঙে গেছে, এ-সত্য অস্বীকার করা চলে না ; আর এই ভাঙনের মুখে সমাজ তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে। তাই স্বাজাত্য সংগঠনের তাগিদ এসে পৌঁছলে আমরা তার উপকরণগুলি খুঁজে পাচ্ছি নে।//

কিন্তু যেমন করেই হোক শাসনযন্ত্রটা আমাদের আয়ত্তাধীন করতে হবে, আর গণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে' রাষ্ট্রে ও সমাজে নবশক্তির প্রেরণা এনে দিতে হবে। উত্তম প্রস্তাব—দেশের রাজনীতি বিশারদেরা আর ইংলণ্ডের কয়েকজন অতিমানুষ এক সঙ্গে মিলে ভারত শাসন সংস্কারের নববিধান প্রবর্ত্তন করলেন। আংশিক পরিমাণে শাসন যন্ত্রের কর্ত্তৃত্বভার আমাদের উপর ন্যস্ত হ'ল বটে, কিন্তু ফল হ'ল কি ? ব্যয় বৃদ্ধি আর সেই তাগিদ মেটাবার জন্য নূতন ট্যাক্স। তারপর এত দিন আমাদের মনিব ছিল একজন—এখন দুই মনিবের মুখের দিকে তাকিয়ে আমাদের প্রয়োজনের আরজি পেশ করতে হয়। একজনকে পল্লীতে জলকষ্টের কথা জানিয়ে যদি বলি, "এর একটা প্রতীকার ক'রে দিন্", তবে তিনি উত্তর করেন "তোমাদের জল খাওয়াবার ভার তোমাদেরই প্রতিনিধি একজন মন্ত্রীর উপর দেওয়া হয়েছে ; তিনি এইসব নিয়ে ব্যাপৃত, অতএব তার কাছে তোমাদের আরজি পাঠিয়ে দেব।" মন্ত্রী বলেন, জলাভাবের জন্য দেশবাসীদের যে কষ্ট তা'র উপর আমার ষোলো আনা সহানুভূতি আছে, কিন্তু রাজকোষ থেকে আমার তহবিলে যে ক'টা টাকা আসে, তা' থেকে তোমাদের দাবী মেটান যাবে না। তবে বিশুদ্ধ পানীয় জল যদি একান্তই তোমাদের চাই, ত সঙ্গে সঙ্গে নতুন কর দিতে দ্বিধা করো না।"

দশ বছর আগে যে ধরণের গণতন্ত্র মণ্টেগু সাহেবের হাত থেকে আমরা পেয়েছিলুম, তা'তে আমাদের রাষ্ট্র-সমস্যার জটিলতা বেড়েছে বই কমে নি। বস্তুতঃ রাজনৈতিক মুক্তির পথটাও দুর্গম ; তা' ছাড়া আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তিটা জীর্ণ হয়ে আছে বলে' আমরা কোনো ব্যবস্থার উপর ভরসা রাখতে পারি নে ! কেবলি মনে আশঙ্কা জাগে সাম্প্রদায়িক ও আর্থিক বিধিব্যবস্থার অসাম্যতা ঐক্য স্থাপনের অন্তরায় হ'য়ে উঠ্বে। আর উঠ্ছেও তাই ; যে আশ্রয়ের উপর ভর করে' ভারতবর্ষে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, সেই পল্লীসমাজে অনৈক্য ও বিরোধের চিহ্ন সুস্পষ্ট। জাতীয়তার উদ্দীপনা আমাদের মনকে নাড়া দিয়েছে সত্য ; কিন্তু পল্লী-সমাজের কেন্দ্রে তা'র সাড়া পৌঁছয়নি বলে রাষ্ট্রবিধির যত কিছু আয়োজন অন্তঃসারশূন্য হয়েছে। সমস্ত ভারতবর্ষে

প্রায় পনর আনা লোক গ্রামে বাস করে; তাদের নিয়েই সমাজ; তারাই রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের মেরুদণ্ড। কিন্তু আজ তারা অবনতির যে সীমায় পৌঁছেছে, সেখান থেকে এদের উদ্ধার পাবার পথ নির্দ্দেশ না করে' শুধু অভিজাত সম্প্রদায়কে নিয়ে যে রাষ্ট্র-রচনা করব, তা' আর যা-ই হোক্, গণতন্ত্র হবে না।

পল্লী-সমাজকে আমি জাতীয় ভিত্তি বলে' মনে করি। প্রায় দশ বছর পূর্ব্বে পল্লী-সমাজের সমস্যা নিয়ে কিছু আলোচনা করেছিলাম; আজ সেই প্রবন্ধগুলি বই আকারে প্রকাশিত হ'ল। দেশের নানা স্থানে যে সকল শিক্ষাকেন্দ্র ও কর্ম্মক্ষেত্র স্থাপিত হচ্চে, যদি তা'র কর্ম্মীরা এই বই পড়ে কিছুমাত্র উপকৃত হন্, তা'হলেই আমার শ্রম সার্থক হবে, এবং যদি তাদের কাছ থেকে উৎসাহ পাই, তবে এ বিষয়ে আরো কিছু আলোচনা করব।

পরমপূজনীয় বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বইখানির ভূমিকা লিখে আমাকে উৎসাহিত করেছেন, এজন্য আমি তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্চি। মানুষ যতক্ষণ বড় আদর্শের সন্ধান না পেয়েছে, ততক্ষণ বাইরের নানা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সামাজিক অবিচার ও ভেদবৈষম্য দূর করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ সমবায়ের যে আদর্শ উপস্থিত করেছেন, তা'র মূলে আছে শুভবুদ্ধি, খাঁটি-স্বদেশপ্রীতি ও মনুষ্যত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। সমবায়ের দ্বারাই আমাদের কর্ম্মচেষ্টা সার্থকতা লাভ করবে, কেননা বিচিত্র জনসঙ্ঘের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করার আর কোনো প্রকৃষ্ট উপায় নেই। ইতি

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

৩৩নং বালিগঞ্জ এভেনিউ,
৯ই আশ্বিন, ১৩৩৮।

ভূমিকা

মানুষের ধর্ম্মই এই যে, সে অনেকে মিলে একত্র বাস করতে চায়। একলা মানুষ কখনই পূর্ণ মানুষ হতে পারে না; অনেকের যোগে তবেই সে নিজকে ষোলো আ'না পেয়ে থাকে

দল বেঁধে থাকা, দল বেঁধে কাজ করা মানুষের ধর্ম্ম বলেই সেই ধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে পালন করাতেই মানুষের কল্যাণ, তার উন্নতি। লোভ, ক্রোধ, মোহ প্রভৃতিকে মানুষ রিপু অর্থাৎ শত্রু বলে কেন? কেননা এই সমস্ত প্রবৃত্তি ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের মনকে দখল করে নিয়ে মানুষের জোট বাঁধার সত্যকে আঘাত করে। যার লোভ প্রবল, সে আপনার নিজের লাভকেই বড় করে দেখে, এই অংশে সে অন্য সকলকে খাটো করে দেখে; তখন অন্যের ক্ষতি করা, অন্যকে দুঃখ দেওয়া, তার পক্ষে সহজ হয়। এই রকম যে-সকল প্রবৃত্তির মোহে আমরা অন্যের কথা ভুলে যাই, তারা যে কেবল অন্যের পক্ষেই শত্রু তা' নয়, তারা আমাদের নিজেরই রিপু, কেননা সকলের যোগে মানুষ নিজের যে পূর্ণতা পায়, এই প্রবৃত্তি তারই বিঘ্ন করে।

স্বধর্ম্মের আকর্ষণে মানুষ এই যে অনেকে এক হয়ে বাস করে, তারই গুণে প্রত্যেক মানুষ বহু মানুষের শক্তির ফল লাভ করে। চার পয়সা খরচ করে কোনো মানুষ একলা নিজের শক্তিতে একখানা সামান্য চিঠি চাটগাঁ থেকে কন্যাকুমারীতে কখনই পাঠাতে পারত না;—পোষ্ট অফিস জিনিষটি বহু মানুষের সংযোগ সাধনের ফল;—সেই ফল এতই বড় যে তা'তে চিঠি পাঠানো সম্বন্ধে দরিদ্রকেও লক্ষপতির দুর্লভ সুবিধা দিয়েচে। এই একমাত্র পোষ্ট অফিসের যোগে ধর্ম্মে, অর্থে, শিক্ষায় পৃথিবীর সকল মানুষের কি প্রভূত উপকার করচে, হিসাব করে তার সীমা পাওয়া যায় না। ধর্ম্মসাধনা, জ্ঞানসাধনা সম্বন্ধে প্রত্যেক সমাজেই মানুষের সম্মিলিত চেষ্টার কত যে অনুষ্ঠান চল্‌চে, 'তা' বিশেষ করে বলবার কোনো দরকার নেই, সকলেরই তা জানা আছে।

তাহলেই দেখা যাচ্চে যে, যে-সকল ক্ষেত্রে সমাজের সকলে মিলে প্রত্যেকের হিতসাধনের সুযোগ আছে, সেইখানেই সকলের এবং প্রত্যেকের কল্যাণ। যেখানেই অজ্ঞান বা অন্যায় বশতঃ সেই সুযোগে কোন বাধা ঘটে, সেইখানেই যত অমঙ্গল।

পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজেই একটা যায়গায় এই বাধা ঘটে। সে হচ্চে অর্থোপার্জ্জনের কাজে। এইখানে মানুষের লোভ তার সামাজিক শুভবুদ্ধিকে ছাড়িয়ে চলে যায়। ধনে বা শক্তিতে অন্যের চেয়ে আমি বড় হব, এই কথা যেখানেই মানুষ বলেচে সেইখানেই মানুষ নিজেকে আঘাত করেচে; কেননা পূর্ব্বেই বলেচি কোন মানুষই একলা নিজেতে নিজে সম্পূর্ণ নয়। সত্যকে যে আঘাত করা হয়েচে তার প্রমাণ এই যে, অর্থ নিয়ে, প্রতাপ নিয়ে মানুষে মানুষে যত লড়াই, যত প্রবঞ্চনা।

অর্থ-উপার্জ্জন শক্তি-উপার্জ্জন যদি সমাজভুক্ত লোকের পরস্পরের যোগে হতে পারত, তাহলে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই সকল ব্যক্তির সম্মিলিত প্রয়াসের প্রভূত ফল সহজ নিয়মে লাভ করতে পারত। ধনীর উপরে বরাবর এই একটি ধর্ম্ম উপদেশ চলে আস্‌ছে যে, তুমি দান কর্‌বে। তার মানেই ধর্ম্ম এবং বিদ্যা প্রভৃতির ন্যায় ধনেও কল্যাণের দাবী খাটে—না খাটাই অধর্ম্ম। কল্যাণের দাবী হচ্চে স্বার্থের দাবীর বিপরীত এবং স্বার্থের দাবীর চেয়ে তা উপরের জিনিষ। দানের যে উপদেশ আছে তাতে ধনীর স্বার্থকে সাধারণের কল্যাণের সঙ্গে জড়িত কর্‌বার চেষ্টা করা হয়েচে বটে, কিন্তু কল্যাণকে স্বার্থের অনুবর্ত্তী করা হয়েচে, তাকে পুরোবর্ত্তী করা হয় নি। সেইজন্য দানের দ্বারা দারিদ্র্য দূর না হয়ে বরঞ্চ তা পাকা হয়ে ওঠে।

ধর্ম্মের উপদেশ ব্যর্থ হয়েচে বলেই, সকল সমাজেই ধন ও দৈন্যের দ্বন্দ্ব একান্ত হয়ে রয়েচে বলেই, যাঁরা এই অকল্যাণকর ভেদকে সমাজ থেকে দূর করতে চান, তাঁদের অনেকেই জবরদস্তির দ্বারা লক্ষ্য সাধন করতে চান। তাঁরা দস্যুবৃত্তি ক'রে রক্তপাত ক'রে,ধনীর ধন অপহরণ ক'রে সমাজে আর্থিক সাম্য স্থাপন করতে চেষ্টা করেন। এ সমস্ত চেষ্টা বর্ত্তমান যুগে পশ্চিম মহাদেশে প্রায় দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তার কারণ হচ্চে, পশ্চিমের মানুষের গায়ের জোরটা বেশি, সেই জন্যেই গায়ের জোরের উপর তার আস্থা বেশি—কল্যাণ সাধনেও সে গায়ের জোর না খাটিয়ে থাক্‌তে পারে না। তার ফলে, অর্থও নষ্ট হয়, ধর্ম্মও নষ্ট হয়। রাশিয়ায় সোভিয়েট রাষ্ট্রনীতিতে তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।

অতএব ধর্ম্মের দোহাই বা গায়ের জোরের দোহাই, এই দুয়ের কোনটাই মানব সমাজের. দারিদ্র্য মোচনের পন্থা নয়। মানুষকে দেখানো চাই যে. বড় মূলধনের সাহায্যে অর্থসম্ভোগকে ব্যক্তিগত স্বার্থের সীমার মধ্যে একান্ত আট্‌কে রাখা সম্ভব হবে না। আজকের দিনে যদি কোনো ক্রোরপতি উটের ডাক বসিয়ে কেবল মাত্র তাঁর নিজের চিঠি চালাচালির বন্দোবস্ত

করতে চান, তাহলে সামান্য চাবার চেয়েও তাঁকে ঠক্‌তে হবে,—অথচ পূর্ব্বকালে এমন এক দিন ছিল যখন ধনীরই ছিল উটের ডাক, আর চাষীর কোনও ডাক ছিল না। সেদিন ধনীকে তাঁর গুরুঠাকুর এসে যদি ধর্ম্ম উপদেশ দিতেন, তবে হয়ত তিনি তাঁর নিজের চিঠিপত্রের সঙ্গে গ্রামের আরও কয়েকজনের চিঠি পত্রের ভারবহন করতে পারতেন, কিন্তু তাতে করে দেশে পত্র-চালনার অভাব প্রকৃতভাবে দূর হতে পারত না। সাধারণের দারিদ্র্য হরণের শক্তি ধনীর ধনে নেই।

সে আছে সাধারণের শক্তির মধ্যেই। এই কথাটা জানা চাই, এবং তার দৃষ্টান্ত সকলের কাছে সুস্পষ্ট হওয়া চাই। কৃত্রিম উপায়ে ধন বণ্টন করে কোনও লাভ নেই, সত্য উপায়ে ধন উৎপাদন করা চাই। জনসাধারণে যদি নিজের অর্জ্জনশক্তিকে একত্র মেলাবার উদ্যোগ করে, তবে এই কথাটা স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে পারে যে, যে-মূলধনের মূল সকলের মধ্যে, তার মূল্য ব্যক্তি-বিশেষের মূলধনের চেয়ে অসীমগুণে বেশি। এইটি দেখতে পারলেই তবে মূলধনকে নিরস্ত্র করা যায়, অস্ত্রের জোরে করা যায় না। মানুষের মনে ধন ভোগ করার ইচ্ছা আছে—সেই ইচ্ছাকে কৃত্রিম উপায়ে দলন করে' মেরে' ফেলা যায় না। সেই ইচ্ছাকে বিরাটভাবে সার্থক করার দ্বারাই তাকে তার সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত করা যেতে পারে।

এক দিন মানুষের ইতিহাসে একদিকে রাজশক্তি অন্য দিকে প্রজাশক্তি এই দুই শক্তির দ্বন্দ্ব আছে। রাজার প্রতি ধর্ম্ম উপদেশ ছিল যে, প্রজার মঙ্গল সাধনই তাঁর কর্ত্তব্য। সে কথা কেউবা শুনতেন, কেউবা আধাআধি শুনতেন, কেউবা একেবারেই শুনতেন না। এমন অবস্থা এখনো পৃথিবীতে অনেক দেশে আছে। অধিকাংশ স্থলেই এই অবস্থায় রাজা নিজের সুখ সম্ভোগ, নিজের প্রতাপ বৃদ্ধিকেই মুখ্য করে' প্রজার মঙ্গল সাধনকে গৌণ করে থাকেন। এই রাজতন্ত্র উঠে গিয়ে আজ দেশে গণতন্ত্র বা ডিমক্রাসির প্রাদুর্ভাব হয়েচে। এই ডিমক্রাসির লক্ষ্য এই যে, প্রত্যেক প্রজার মধ্যে যে আত্মশাসনের ইচ্ছা ও শক্তি আছে তারই সমবায়ের দ্বারা রাষ্ট্রশাসন-শক্তিকে অভিব্যক্ত করে তোলা। আমেরিকার যুক্তরাজ্য এই ডিমক্রাসির বড়াই করে থাকে।

কিন্তু যেখানে মূলধন ও মজুরীর মধ্যে অত্যন্ত ভেদ আছে, সেখানে ডিমক্রাসি পদে পদে প্রতিহত হতে বাধ্য। কেননা সকল রকম প্রতাপের প্রধান বাহক হচ্চে অর্থ। সেই অর্থ-অর্জ্জনে যেখানে ভেদ আছে, সেখানে রাজপ্রতাপ সকল প্রজার মধ্যে সমানভাবে প্রবাহিত হতেই পারে না। তাই

য়ুনাইটেড্-ষ্টেট্সে রাষ্ট্র-চালনার মধ্যে ধনের শাসনের পদে পদে পরিচয় পাওয়া যায়। টাকার জোরে সেখানে লোকমত তৈরী হয়, টাকার দৌরাত্ম্যে সেখানে ধনীর স্বার্থের সর্ব্বপ্রকার প্রতিকূলতা দলিত হয়—এ'কে জন-সাধারণের স্বায়ত্ত শাসন বলা চলে না।

এই জন্যে, যথেষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতাকে সর্ব্বসাধারণের সম্পদ করে তোলবার মূল উপায় হচ্চে ধন অর্জ্জনে সর্ব্বসাধারণের শক্তিকে সম্মিলিত করা। তাহলে ধন টাকা আকারে কোন একজনের বা এক সম্প্রদায়ের হাতে জমা হবে না, কিন্তু লক্ষপতি ক্রোরপতিরা আজ ধনের যে ফল ভোগ করবার অধিকার পায়, সেই ফল সকলেই ভোগ করতে পারে। সমবায় প্রণালীতে অনেকে আপন শক্তিকে যখন ধনে পরিণত করতে শিখবে, তখনই সর্ব্ব মানবের স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপিত হবে।

এই সমবায় প্রণালীতে ধন উৎপাদন করার আলোচনা ও পরীক্ষা আমাদের দেশে সংপ্রতি আরম্ভ হয়েচে। আমাদের দেশে এর প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। দারিদ্র্য থেকে রক্ষা না পেলে আমরা সকল রকম যমদূতের হাতে মার খেতে থাক্‌ব। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ধন নিহিত হয়ে আছে, এই সহজ কথাটি বুঝলে এবং কাজে খাটালে তবেই আমরা দারিদ্র্য থেকে বাঁচব।

দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনক্ষম করে গড়ে তুল্‌তে হবে। এ-জন্য কতকগুলি পল্লী নিয়ে এক একটি মণ্ডলী স্থাপন করা দরকার; সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্ম্মের ও অভাব মোচনের ব্যবস্থা করে' মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্য্যাপ্ত করে' তুল্‌তে পারে, তবেই স্বায়ত্ত শাসনের চর্চ্চা দেশের সর্ব্বত্র সত্য হয়ে উঠ্‌বে। নিজের পাঠ-শালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্ম্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য পল্লীবাসিদের শিক্ষা, সাহায্য ও উৎসাহ দান করতে হবে। এম্‌নি করে' দেশের পল্লীগুলি আত্মনির্ভরশীল ও ব্যূহবদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌লেই আমরা রক্ষা পাব। কি-ভাবে বিশিষ্ট পল্লীসমাজ গড়ে তুল্‌তে হবে, এই হচ্চে আমাদের প্রধান সমস্যা। যে-বইখানির ভূমিকা লিখ্‌চি, সেই বইয়ে এই সমস্যার কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিছু বুঝিতে পারিল না—সুজলা, সুফলা, মলয়জ শীতলা শস্যশ্যামলা মাতা কে—জিজ্ঞাসা করিল, "মাতা কে?"

উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গায়িতে লাগিলেন—

"সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্।"

মহেন্দ্র বলিল, "এত দেশ, এত মা নয়—"

ভবানন্দ বলিলেন, "আমরা অন্য মা মানি না—

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

—আনন্দমঠ

জাতীয় ভিত্তি

প্রথম প্রস্তাব

আমাদের দেশটা পল্লীপ্রধান। পল্লীতেই লোক সংখ্যা বেশী; আর, দেশের অর্থ-সম্পদও সেখান থেকেই অধিক সংগৃহীত হয়—রাজস্ব-ভাণ্ডারে পল্লীবাসিদের দেয় টাকার পরিমাণ সব-চেয়ে বেশী। কিন্তু কেবল লোকজন ও টাকা-কড়ির হিসেবে পল্লীগুলির গুরুত্ব, আর সেই কারণে রাষ্ট্র বা সমাজ ব্যবস্থায় এর প্রাধান্য দেওয়া দরকার, তা নয়;—আমাদের দেশের সত্য পরিচয় পেতে হ'লে পল্লী-সমাজকে জানা চাই। ভারতীয় সভ্যতা পল্লীকেন্দ্রে বিচিত্র সমাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে নিজের প্রতিভা প্রকাশ করেছে; আজ যদি তা' ম্লান হ'য়ে থাকে, তার কারণ সমাজের আভ্যন্তরীন বিচ্ছেদ। এই জন্য আজ মানুষের সঙ্গে মানুষের, সামাজিক এক স্তরের সঙ্গে অপরের যোগাযোগের পথ অবরুদ্ধ; নানা বিকৃতি ও বিরূপ সমাজ ব্যবস্থায় স্থান অধিকার করে' বসেছে।

কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাতে হ'লে পল্লী জীবনের কেন্দ্রে এক দিন যে-শক্তি কাজ করছিল. তার পরিচয় পাওয়া দরকার। ভারতীয় সভ্যতা বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণীর মধ্যে যে ঐক্য-সূত্র স্থাপন ক'রে সমাজকে গড়ে তুলছিল, আজ পুনর্গঠনের দিনে সেই সত্য সম্বন্ধের ভিত্তি আমাদের আবিষ্কার করতে হবে।

পল্লীসংস্কার করবার তাগিদ আমাদের মনে উপস্থিত হলেই আমরা সরকারী বিধিব্যবস্থার দিকে তাকাই। গ্রামের হিতসাধনার্থ নানা প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ তালিকা দেখ্‌লে মনে হয়, এমন ব্যবস্থার সাহায্যে গ্রামের শিক্ষা, স্বাস্থ্য কৃষি, শিল্প, রাস্তাঘাট সবই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হ'তে পারে। যারা পল্লীগ্রামে বাস করেন তারা কিন্তু সাক্ষ্য দেন যে, এই আয়োজন সম্পূর্ণ প্রয়োজন মেটাতে

পারে না ; এমন কি কেবলমাত্র এর উপর নির্ভর করে' থাকাও আর চলে না। গ্রামে রাস্তাঘাট ভাল নয়, স্বাস্থ্য খারাপ, শিক্ষার অভাব, শিল্প ব্যবস্থা মৃতপ্রায়—এই জন্য পল্লীর জীবন শুকিয়ে-আস্‌ছে ; শরীর শুষ্‌ছে রোগে, মন নিস্তেজ হচ্চে নিরানন্দে।

এ হেন দুর্গতির জন্য দোষী করব কা'কে ? শাসন-যন্ত্রের কল-কব্জার সাহায্যে যত সব প্রতিষ্ঠান্ হয়েছে, তা'তে প্রাণশক্তির উৎসকে বাধা মুক্ত করতে পারছে না ; অতএব আজ আমাদের সমস্যা হচ্চে পল্লীজীবনের কেন্দ্রে জীবনীশক্তির সন্ধান করা। রাষ্ট্রশক্তি ও শাসনপদ্ধতি শান্তি রক্ষা করতে পারে ও শৃঙ্খলা এনে দিতে পারে, কিন্তু পল্লী-জীবনকে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারে নি। কৃষি থেকে রাজকোষে প্রচুর ধনাগম হয় ; কৃষকেরা দেশকে অন্ন যোগায়, রপ্তানির কাঁচা মাল এদের হাত থেকে নিয়ে বিপুল বাণিজ্যের সৃষ্টি হয়েছে ; অতএব পল্লীর কথা নিয়ে কখন কখন রাজ-দরবারেরও আলোচনা তর্ক-বিতর্ক হয়ে' থাকে। দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে অনেকবার 'কমিশন' বসেছে ; কৃষিজীবিদের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ নজরে পড়া মাত্র, তার কারণ তদন্ত করা হয়েছে ; তারপর এদের চাষবাসের উন্নতি ও নষ্ট শিল্পোদ্ধারের জন্য সরকারী কর্ম্মচারীরা চেষ্টাও করেছেন। তবুও পল্লীর অবস্থা দেখে মনে হয় দুর্গতির মাত্রা কমে নি, দুর্গ্রহের প্রকোপ হ্রাস হয় নি। ব্যাধির মূল যেখানে সম্ভবত সেখানে এখনও আমাদের দৃষ্টি পৌঁছয় নি।

আমার মনে হয়, পল্লীজীবনের ঐক্যসূত্রগুলি বিছিন্ন হ'য়ে গেছে বলেই আমাদের দৈন্য ঘুচ্‌ল না। অতএব, প্রথম কাজ হচ্চে এক দিন সমাজের বিভিন্ন স্তর যে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত ছিল, তার অনুসন্ধান করা, এবং তারই উপর ভর করে বর্ত্তমান কালোপযোগী প্রতিষ্ঠানের পত্তন করা। এই প্রতিষ্ঠানই জাতীয়-জীবনের ভিত্তি।

ঐক্যের কথা বল্‌লেই প্রশ্ন উঠ্‌বে আমাদের সমাজে নানা শ্রেণী নানা দল পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ঐক্য দৃঢ়ভাবে রক্ষা করতে পারে নি। এর কারণ সম্ভবতঃ রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও প্রবলের সংঘাত ; কিন্তু এই আঘাতের দ্বারা সমাজের দেহে যে প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, আজ তারই অভিব্যক্তি পল্লী সংস্কারদের দৃষ্টি গোচর হওয়া চাই। এই প্রক্রিয়ার অভিব্যক্তির উপর আস্থা রেখে আমাদের কাজ করতে হবে। আজ যদি দেখি সমাজের নানা অঙ্গে শৈথিল্য এসেছে তবু জান্‌ব এই দুর্গতি চিরন্তন নয়।

সভ্যতার বহিরাবরণ ত হচ্চে জাতীয় আত্মার স্বরূপেরই বহিঃ প্রকাশ মাত্র। আমাদের পরিবার, সমাজ, ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান্ রাজা-প্রজার সম্বন্ধ এক দিন

যে সত্যকে আশ্রয় করে' সজীব হ'য়ে উঠেছিল, আজ তার বিকৃতি ঘটেছে বলে আমাদের বহিরাবরণটাও জীর্ণ হয়ে যাচ্চে। কিন্তু যা সত্য তা'র বিনাশ নেই; তাই দেখ্‌তে পাই সাহিত্য, শিল্পকলা, সামাজিক নানা ব্যবহার, উৎসব পদ্ধতি, ইত্যাদি বিবিধ ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অন্তরাত্মা আবার নিজেকে প্রকাশ করছে। ক্রমশঃই এই প্রকাশ সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ছে বলেই আমাদের মনে জাতীয় চেতনা নব উদ্দীপনার সৃষ্টি করছে।

কিন্তু এই চেতনা জাতীয় অঙ্গের সর্ব্বত্র প্রসারিত হচ্চে না; কেননা দেশের অধিকাংশ জনসংখ্যা যারা পল্লীতে বাস করে, তাদের মধ্যে সজীবতা সঞ্চারিত করবার বিশেষ কোনো উদ্যোগ নেই। তারা আমাদের সংস্পর্শের বাহিরে আছে বলে' এক দিকে যেমন তাদের সকল ব্যবস্থা বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্চে, অপর দিকে আমাদের মনের উদ্দীপনাও কর্ম্মক্ষেত্রের আশ্রয় না পেয়ে নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়চে। বাহিরের বাধা বিঘ্নের চেয়েও পল্লীজীবনের জড়গ্রস্তভাব পল্লী-সংস্কারের পক্ষে অন্তরায় হয়ে' উঠেছে। তারপর, যারা পল্লীর পুনর্গঠন করতে গিয়ে মনে করেন একটু-আধটু লেখাপড়ার ব্যবস্থা, দু'-একটা দাতব্য চিকিৎসালয়, গোটা কয়েক তাঁত ও চরকা প্রভৃতির আয়োজন করলেই পল্লী-সমাজ গড়ে উঠ্‌বে, পল্লীজীবনে প্রাণ সঞ্চার হবে, তারা সমস্যার মূলে দৃষ্টি দিতে পারলেন না। কেন রাষ্ট্রীয় বহু ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও পল্লী-জীবন সঞ্জীবিত হ'তে পারে নি, এই প্রশ্নও মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক।

দেশহিতৈষীরা বলেন, রাষ্ট্রীয় মুক্তি লাভ না করা পর্য্যন্ত কোনো কাজই পাকা হতে পারে না। কথাটা এই হিসেবে সত্য যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সুযোগ সুবিধা পেলে কর্ম্মপদ্ধতির অনুসরণ করা সহজ সাধ্য হতে পারে। নানা কারণে আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র সংকীর্ণ হয়েছে; আমাদের বিচ্ছিন্ন শক্তি ব্যূহবদ্ধ শাসন-তন্ত্রের প্রাচীর ডিঙিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না, আমরা কাজে হাত দিয়ে বারম্বার তা' বুঝ্‌তে পারি। আমাদের কর্ম্মচেষ্টা দানা বাঁধলেই রাষ্ট্র ও সমাজ এই দুইয়েরই সঙ্গে কর্ম্মীদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। তারপর, নিস্ফল চেষ্টার ফলে দেশের যুবকদলের চিত্তে যে নৈরাশ্য দেখা দেয়, আজ তার চিহ্ন সুস্পষ্ট।

তবু স্বদেশের হিতসাধন করবার অধিকার থেকে আমাদের কেউ বঞ্চিত করতে পারে না। আত্মকর্ত্তৃত্বের ন্যায্য অধিকারের জোরে আমরা যদি আজ আমাদের সমাজের বিচ্ছিন্ন ঐক্যসূত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, তবে বাই-রের বাধা অতিক্রম করা কঠিন হবে না। যা'কে বলে Spirit of the Community অর্থাৎ মণ্ডলীর মধ্যে ঘনিষ্টতার ভাব সর্ব্বপ্রথমে যেমন ক'রে

হোক', জাগানো চাই। যদি তাই জাগে, তবে বাইরের আঘাত, উৎপাত, দণ্ড যতই আসুক না কেন, আমাদের বন্ধনকে আরো দৃঢ় ক'রে তুল্‌বেই। আঘাত প্রতিঘাতের দ্বারা দেশের মধ্যে ক্রমশঃ নানা প্রক্রিয়া সুরু হ'তে থাক্‌বে।

পল্লীসংস্কারের কাজটাকে এই জন্য খাটো করে দেখলে চল্‌বে না; এর আদর্শকে সংকীর্ণ সীমার মধ্যে বদ্ধ রাখলে উন্নত সভ্যতার শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলি সংগৃহীত হ'তে পারবে না। গ্রামের পাঠশালা, হাঁসপাতাল, ঔষধালয়, প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করবার প্রস্তাব উঠলে অনেকেই মনে করেন, যেমন-তেমন একটা ব্যবস্থা হ'লেই হ'ল। বর্ত্তমান কালের উপযোগী করে, এই-সব আয়োজন করবার প্রস্তাব করলে হাস্যাস্পদ হ'তে হয়; নাগরিকদের জন্য বিংশতি শতাব্দীর সমস্ত ব্যবস্থা চাই, কিন্তু গ্রামবাসীদের জন্য মধ্যযুগের ব্যবস্থা হলেই চল্‌বে, এইরূপ অভিমতও শুনেছি।

আমি বল্‌ছি, যারা গ্রামে কাজ করবেন তাদের মনে রাখা দরকার যে ক্ষুধিতকে অন্ন দেওয়া, বস্ত্রহীনকে কাপড় দেওয়া, রুগ্নকে চিকিৎসা করা এ-সব কাজ বিশেষ জরুরী হ'লেও আসল কাজ হচ্চে গ্রামের একদল কর্ম্মীকে উদ্বোধিত করা এক বড় আদর্শে,—সে হচ্চে পল্লীসমাজের পুনর্গঠন। ভিক্ষা বা অনুগ্রহের দ্বারা পল্লীর এ কাজ হবে না। সেখানে দেখতে পাচ্চি, জীবনের প্রবাহ বদ্ধ, জীবনীশক্তির প্রকাশ-পথ অবরুদ্ধ; অতএব মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রধান প্রতিবন্ধকগুলি সরিয়ে দেওয়া হচ্চে পল্লীসংস্কারের আদর্শ; আর, এর প্রথম সোপান হচ্চে, পল্লীবাসীদের চিত্তকে বহু আবর্জ্জনার আবরণ থেকে মুক্তি দেওয়া।

ঠিক কোন্ আদর্শের মাপকাঠিতে পল্লীসমাজ গড়া যাবে, এই নিয়ে অনেকের মনে নানা তর্ক উপস্থিত হয়। আসল কথা বাঁধাবাধি এমন কোনো সূত্র (formula) দেওয়া যায় না—যার ব্যবহার সকল ক্ষেত্রে সকল অবস্থায় খাটতে পারে। যে অঞ্চলে পল্লীকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করা হবে, সেখানকার যাবতীয় অবস্থা সম্বন্ধে কর্ম্মীদের মনে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

কিন্তু পল্লী-গঠনের আদর্শ সম্বন্ধে মোটামুটি এই বলা যেতে পারে যে, প্রাচীন সমাজ-সংস্থান যতই ভাল হোক না কেন, আজ তার সঙ্গে নবীনের যোগ রক্ষা না করে কাজে হাত দিতে গেলে আমরা ভুল করব। দেশের কর্ম্মীগণ আজ পল্লী-সমস্যা নিয়ে চিন্তা করুন; বাংলার পল্লীচিত্র আমাদের মানসপটে অঙ্কিত হোক, কেননা ভাব-বস্তুই (idea) কাজের মধ্যে ক্রমে

ক্রমে রূপ ধারণ করে' ওঠে। শাস্ত্রকারেরা বলেছেন "তপস্তপ্তা সর্ব্বমিদং অসৃজত" অর্থাৎ তিনি যা' কিছু সৃষ্টি করলেন, তার কেন্দ্র হচ্চে মন।

তারপর, রাতারাতি ফল পাবার লোভে আমরা যদি যেমন-তেমন একটা ব্যবস্থা করে বসি, তবে দেখতে পাব, পল্লীসমাজের মাটির সঙ্গে আমাদের যোগ স্থাপিত হয় নি। এই কারণে কাজ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ না হলে আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে বসি। সে-বার স্বদেশী আন্দোলনের দিনে, এবার এই রাজনৈতিক উত্তেজনার মুখে আমরা এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখেছি। অতএব এ-কথা বারম্বার স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, সহজে আমাদের পল্লী-গুলির সংস্কার সম্ভব হবে না; ভাবের রসে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বা আধ্যাত্মিকতার দোহাই মাত্র দিয়ে এই তপস্যায় সিদ্ধিলাভ হয় না।

আয়র্ল্যাণ্ডে যারা পল্লী-সংস্কারের কাজে ব্রতী হ'য়েছিলেন, তাদের মধ্যে এক দল দীর্ঘকাল এই তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। রাতারাতি একটা কিছু পরিবর্ত্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন বিপ্লববাদীরা, আর এদের দৃষ্টি ছিল কেল্টিক সভ্যতার বিশেষ ছাঁচের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পল্লী-জীবনের প্রাণকে সঞ্জীবিত করা। আমাদের কাজ মানুষের শক্তিকে সংহত করে তোলা; সমাজের রুদ্ধ গতি-পথকে মুক্ত করে দেওয়া; এমন উপকরণ সংগ্রহ করা যার সাহায্যে পল্লী-সমাজ প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে। অপর পক্ষ মনে করেন, এমন ক'রে দেশকে গড়ে তারপর স্বাধীনতা লাভ করতে হ'লে বহু যুগ কেটে যাবে। এর উত্তরে বলা যেতে পারে, ভারতবর্ষে বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন নানা জাতির মধ্যে বহু বিরোধের সমন্বয়ের চেষ্টা ত সময় সাপেক্ষ। বিপ্লবের ঝঞ্ঝাবাত এনে কোনো কল্যাণ আশা করা যেতে পারে না। ভারতীয় সভ্যতার অন্তস্থলে যে স্বাভাবিক ঐক্যতত্ত্ব বর্ত্তমান, যার আশ্রয়ে বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সম্বন্ধ সূত্র গ্রথিত হয়েছিল, আজ সেই প্রতিভার সাহায্যে আবার আমাদের সামাজিক ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য ঘটাতে হবে। তারপর সমস্ত এশিয়ায় যদি মহাবিপ্লবও উপস্থিত হয়, আমাদের সংহত শক্তি আমাদের সমাজকে রক্ষা করবে।

পল্লী সংস্কার করবার প্রস্তাব নিয়ে আমি যে—সব আদর্শের উল্লেখ করলুম, অনেকের কাছে তা' অত্যন্ত কাল্পনিক বলে মনে হবে। এই প্রসঙ্গে কবি এ-ইর (Æ) এক প্রবন্ধ থেকে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করছি:—

"It will appear to the idealist who has contemplated the heavens more closely than the earth that the policy I advocate is one which only tardily could be put into operation and

would be paltry and inadequate as a basis for society. The idealist with the Golden Age already in his heart believes he has only to erect the Golden Banner and display it for multitudes to array themselves beneath its folds; therefore, he advocates not, as I do, a way to the life, but the life itself. I am sympathetic with idealists in a hurry but I do not think that the world can be changed suddenly by some heavenly alchemy. Though the heart in us cries on continually "Oh hurry, hurry to the golden age", though we think of revolutions we know that the patient marshalling of human forces is wisdom."

ভাবার্থঃ—কল্পনারাজ্যে যাদের বাস এমন ভাবুকের দল মনে করবেন আমি যা' প্রস্তাব ক'রছি তা হাতে-কলমে করতে বহুকাল কেটে যাবে। সুধু তাই নয়, এই কর্ম্মচেষ্টা দ্বারা যে-ভিত গাঁথব তাও সমাজের কাছে অকিঞ্চিৎকর। সত্যযুগের আদর্শ যাঁরা অন্তরে পোষণ করেন, তাঁরা ভাবেন, একবার পতাকা উড়িয়ে ডাক দিলেই দলে দলে লোক এসে জুটবে। এই আশায় উৎফুল্ল হ'য়ে তাঁরা "পথ ও পাথেয়" নিয়ে মাথা ঘামান্ না—একেবারে সিদ্ধির চরম অবস্থাটাই তাঁদের মনকে অধিকার ক'রে বসেন। জীবনের পরিপূর্ণতার চেহারাটাই তাঁরা দেখেন, জীবনীশক্তি লাভের পথটা তাঁদের দৃষ্টিকে যেন এড়িয়ে যায়। এই দলের সঙ্গে আমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু কোনো ঐশিক মন্ত্রবলে পৃথিবীটার ধাত বদ্‌লান যায়, একথা আমি বিশ্বাস করি নে। যদিও আমাদের মন ক্রমাগতই বলে "চল্, চল্ চল্‌রে ও ভাই, সেই সব পাওয়ার দেশে চল্", যদিও মনে ভাবি বিপ্লবের বন্যা আসুক, তবুও বুঝতে পারি ধীরে ধীরে মনুষ্যত্বের উপকরণ সংগ্রহ করা, তার শক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করা এই হ'চ্চে বুদ্ধিমানের কাজ।

আমি মনে করি পল্লী-সমাজের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে সংহত করার কাজটা সব-চেয়ে জরুরী। যেখানে জীবনের উৎস রুদ্ধ হয়েছে, তার স্বাভাবিক ক্রিয়াও বন্ধ হ'বার উপক্রম, আজ বাংলাদেশের যুবকদের দৃষ্টি সেইখানে পড়ুক। যেমন ক'রে হোক, আমাদের সমাজের মধ্যে গতির সঞ্চার করতে হবে। এ মহৎ ব্রতে ব্রতী হবেন কারা? যারা ঐতিহাসিক সত্যের মূলকেন্দ্র উপলব্ধি ক'রে জাতীয় জীবনকে সচেতন করবার সাধনায় প্রবৃত্ত হবেন সেই কর্ম্মীর দল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

আজ আমাদের দেশের মধ্যে একটা আন্দোলনের সাড়া জেগেছে। সেবার এর সূত্রপাত হয়েছিল বঙ্গবিভাগ নিয়ে; কিছুকাল পরে সে আন্দোলন থেমে যায়। তারপর আবার সুরু হয় জালিনওয়ালাবাগের দুর্ঘটনা থেকে। এরকম এক-একটা আঘাতের দ্বারা অকস্মাৎ দেশাত্মবোধ জেগে ওঠা একটা শুভলক্ষণ বটে, কিন্তু বক্তৃতা, শোভাযাত্রা প্রভৃতি আয়োজনে যদি কেবলমাত্র উত্তেজনা এনে দেয় তবে কোনা স্থায়ী ফল আশা করা যেতে পারে না। আমাদের প্রয়োজন পাকা ভিত গেঁথে তোলার চেষ্টা করা,—সে কাজ কর্‌তে হয় অনেক ভেবে চিন্তে; কর্ম্ম সাধনে আমাদের প্রবৃত্ত করবার জন্য উত্তেজনার প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু কর্ম্মের সার্থকতা নির্ভর করে আমাদের বিচার শক্তির উপর। উত্তেজনার আবেগে ভিত্ত ভাঙ্গতে পারি, কিন্তু গাঁথতে পারি নে। আমরা বিদেশী গভর্ণমেণ্টর সঙ্গে ঝগড়া করে বল্‌ছি—তোমাদের রাষ্ট্রীয়-বিধি ব্যবস্থা শয়তানী (satanic), তোমাদের শাসনপদ্ধতির কলকব্জায় আমাদের পিষে মারছে, তোমাদের আশ্রয়ে থেকে বিদেশী বণিকেরা আমাদের ধন দৌলত লুটে নিচ্চে, ইত্যাদি। কিন্তু আমি মনে করি, "Every people get the kind of government they deserve"—যে জাতি যেমন রাষ্ট্র-পদ্ধতির যোগ্য, ঠিক তেম্‌নিই তার ভাগ্যে জুটে থাকে। এ-কথাটি আমি উদ্ধৃত কর্‌ছি আয়র্লাণ্ডের কবি এ-ইর বই থেকে। তিনি সে দেশের দেশানুরাগী কর্ম্মীদের বলেছেন, "তোমরা নিজেদের চেষ্টায় তোমাদের জটীল সমস্যার মীমাংসা কর, এ মনে ক'র না যে পার্লিয়ামেণ্ট থেকে তারা সব মালমস্‌লা যোগাবে, তোমার ঘর বাড়ী মাঠ ঘাঠ তারাই তৈরি করে' দেবে।"

সভ্যতা বল্‌তে এখন আমরা যা' বুঝি, তার সৃষ্টি হয়েছে সহরে, তার বিস্তৃতিও হ'য়েছে সহরের ইট-ইমারত, দোকান-পশার ও রাজপ্রাসাদে। সহরের বাহিরে পল্লীগ্রামে যারা বাস করে,—চাষী তাঁতি, জোলা, প্রভৃতি,

তাদের যেন একরকম হিসেবের বাইরে ফেলা হয়েছে। রাজা রাজ্য পত্তন কর্‌লেন সহরে, আর সেখানে এসে জুট্‌লেন একদল ধনী। তাদের পরামর্শে ও সহায়তায় রাজা সমস্ত দেশ শাসন কর্‌তে লাগ্‌লেন এবং শাসনের সুব্যবস্থা কর্‌বার জন্য এখানে ওখানে গোটা কয়েক সহর তৈরী হল। যাঁরা রাজার আশে-পাশে রইলেন, তাঁরাই সমস্ত দেশের জন্য আইন কানুন রচনা কর্‌লেন,—সহরের বাইরে যে বিপুল জনসংখ্যা তারা সে-সব আইন মেনে নিলে বটে, কিন্তু বুঝ্‌তে পার্‌লে না কারা নেপথ্য থেকে তাদের সুখদুঃখের কথা ভাব্‌ছে!

য়ুরোপীয় সভ্যতার কথা বল্‌তে গিয়ে একজন সুপ্রসিদ্ধ লেখক বলেছেন—"Civilization in historical times has been a flare-up on a few square miles of brick and mortar." "ঐতিহাসিক যুগের সভ্যতা কয়েক বর্গমাইল জায়গা-জোড়া ইঁটপাথরের স্তূপের উপর ঝলক দিয়ে উঠেছে।" ভারতবর্ষে সভ্যতার বিকাশ কিন্তু এমন করে হয় নি। তার রাজা রাজ্যও চালিয়েছেন, আড়ম্বরেরও কোনো অভাব ঘট্‌তে দেন নি, কিন্তু ঋষির তপোবনকে ও গুরুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমকে তাঁরা হিসেবের বাইরে রাখেন নি। আমাদের সভতার আদর্শ গড়ে উঠেছে এই তপোবন ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমকে ঘিরে, রাজধানীর রাজসিক আড়ম্বর এর মহিমা খর্ব্ব করেনি।

পল্লীসমাজ সংস্কার কর্‌বার সংকল্প নিয়ে আজ যাঁরা বেরিয়েছেন অথবা যাঁরা মনে মনে ভাব্‌ছেন এই মহৎ কর্ত্তব্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ কর্‌বেন, তাঁদের এই কথাটি সর্ব্বপ্রথমে জানা দরকার যে civilization বা সভ্যতা বল্‌তে ইংরাজী পুঁথিতে যে আদর্শের কথা বলা হয় যে মাপকাঠিটা হুবহু ব্যবহার কর্‌লে চল্‌বে না। সহরের রাজপ্রাসাদ, রাজপথ, যানবাহন, আমোদ-প্রমোদের বিপুল আয়োজন—এই নিয়ে মনশ্চক্ষে যে-মূর্ত্তিটি জাগে, আমরা ভ্রম করে বসি—ভাবি অমন্‌টি না হ'লে Civilization সভ্যতার পত্তন হল না। তা' নয়, সকল দেশেরই সভ্যতার একএকটা বিশেষ ধারা আছে।

পল্লী সমাজই হচ্ছে দেশের প্রাণ; যে দিন থেকে এই পল্লী ত্যাগ ক'রে আমরা সহুরে হয়েছি, সে দিন থেকে এর ধ্বংস সুরু হয়েছে। ক্রমশই অবস্থা শোচনীয় হ'য়ে উঠেছে; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প ও কৃষির অবনতি ঘটছে, আর বিনাশের সবচেয়ে মারাত্মক চিহ্ন হচ্ছে এই যে পল্লী-সমাজের ধর্ম্ম ও নীতির নিত্য অবনতি দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু যাই হোক্ আজ আমরা "স্বরাজ" চাই। অতএব এই বেলা

তো ঘরের দিকে তাকাতে হবে! একবার দেখ্‌তে হবে যাদের নিয়ে স্বরাজ ভোগ করবো, তাদের অর্দ্ধমৃত দেহে একটু প্রাণশক্তির সঞ্চার করা যায় কিনা। দেশের অধিকাংশ লোক বাস করে পল্লীতে, অতএব স্বরাজের আকৃতি প্রকৃতিটা পল্লী-সমাজের উপযোগী হওয়া চাই। এই কথাই সেবারে স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গলার প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনেছিলাম। তাঁর লেখা "স্বদেশী সমাজ", "অবস্থা ব্যবস্থা" প্রভৃতি প্রবন্ধ থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত কর্‌ছি।

"কল আসিয়া যেমন তাঁতকে মারিয়াছে, তেমনি ব্রিটিশ-শাসনও সর্ব্বগ্রহ ও সর্ব্বব্যাপী হইয়া আমাদের গ্রাম্য সমাজের সহজ ব্যবস্থাকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। কালক্রমে প্রয়োজনের বিস্তার বশতঃ ছোট ব্যবস্থা যখন বড় ব্যবস্থায় পরিণত হয়, তখন তাহাতে ভাল বই মন্দ হয় না; কিন্তু তাহা স্বাভাবিক পরিণতি হওয়া চাই। আমাদের যে গ্রাম্যব্যবস্থা ছিল, ছোট হইলেও তাহা আমাদেরই ছিল, ব্রিটিশ ব্যবস্থা যত বড়ই হউক, তাহা আমাদের নহে। সুতরাং তাহাতে যে আমাদের কেবল শক্তির জড়তা ঘটিয়াছে তাহা নহে, তাহা আমাদের সমস্ত প্রয়োজন ঠিক মত করিয়া পূরণ করিতে পারিতেছে না। নিজের চক্ষুকে অন্ধ করিয়া পরের চক্ষু দিয়া কাজ চালানো কখনই ঠিক মত হইতে পারে না।

এখন তাই দেখা যাইতেছে গ্রামের মধ্যে চেষ্টার কোনো লক্ষণ নাই। জলাশয় পূর্ব্বে ছিল, আজ তাহা বুজিয়া আসিতেছে, কেননা দেশের স্বাভাবিক কাজ বন্ধ। যে গোচারণের মাঠ ছিল তাহা রক্ষণের কোনো উপায় নাই; যে দেবালয় ছিল তাহা সংস্কারের কোনো শক্তি নাই; যে সকল পণ্ডিত সমাজের বন্ধন ছিলেন তাঁহাদের গণ্ডমূর্খ ছেলেরা আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যের ব্যবস্থা ধরিয়াছে; যে সকল ধনী গৃহে ক্রিয়াকর্ম্মে যাত্রায় গানে সাহিত্যরস ও ধর্ম্মের চর্চ্চা হইত, তাঁহারা সকলেই সহরে আকৃষ্ট হইয়াছেন; যাঁহারা দুর্ব্বলের সহায়, শরণাগতের আশ্রয় ও দুষ্কৃতিকারীর দণ্ডদাতা ছিলেন, তাঁহাদের স্থান আজ পুলিশের দারোগা কিরূপ ভাবে পূরণ করিতেছে তাহা কাহারো আগোচর নাই; লোকহিতের কোনো উচ্চ আদর্শ, পরার্থে আত্ম-ত্যাগের কোনো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গ্রামের মাঝখানে আর নাই; কোনো বিধি-নিষেধের শক্তি ভিতর হইতে কাজ করিতেছে না; আইনে যে কৃত্রিম বাঁধ দিতে পারে, তাহাই আছে মাত্র; পরস্পরের বিরুদ্ধে মিথ্যা-মকদ্দমায় গ্রাম উন্মাদের মতন নিজের নখে নিজেকে ছিন্ন করিতেছে, তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার কেহ নাই; জঙ্গল বাড়িয়া উঠিতেছে, ম্যালেরিয়া নিদারুণ হইতেছে, দুর্ভিক্ষ ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে; আকাল পড়িলে পরবর্ত্তী ফসল পর্য্যন্ত ক্ষুধা মিটাইয়া

বাঁচিবে এমন সঞ্চয় নাই ; ডাকাত অথবা পুলিশ চুরি অথবা চুরি-তদন্ত জন্য ঘরে ঢুকিলে ক্ষতি ও অপমান হইতে আপনার গৃহকে বাঁচাইবে এমন পরস্পর ঐক্য মূলক সাহস নাই ; তারপর যা খাইয়া শরীর বল পায় ও ব্যাধিকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে তাহার কি অবস্থা ! ঘি দূষিত, দুধ দুর্ম্মূল্য, মৎস্য দুর্ল্ভ, তৈল বিষাক্ত ; যে কয়টা স্বদেশী ব্যাধি ছিল তাহারা আমাদের যকৃৎ প্লীহার উপর সিংহাসন পাতিয়া বসিয়াছে ; তাহার উপর বিদেশী ব্যাধিগুলা অতিথির মত আসে এবং কুটুম্বের মত রহিয়া যায় ;—ডিপ্‌থিরিয়া, রাজযক্ষ্মা, টাইফয়েড্, সকলেই এই রক্তহীনদের প্রতি Exploration-নীতি অবলম্বন করিয়াছে। অন্ন নাই, স্বাস্থ্য নাই, আনন্দ নাই, ভরসা নাই, পরস্পরের সহ-যোগিতা নাই ; আঘাত উপস্থিত হইলে মাথা পাতিয়া লই, মৃত্যু উপস্থিত হইলে নিশ্চেষ্ট হইয়া মরি, অবিচার উপস্থিত হইলে নিজের অদৃষ্টকেই দোষী করি, এবং আত্মীয়ের বিপদ উপস্থিত হইলে দৈবের উপর তাহার ভার সমর্পণ করিয়া বসিয়া থাকি। ইহার কারণ কি ! ইহার কারণ এই, সমস্ত দেশ যে শিকড় দিয়া রস আকর্ষণ করিবে সেই শিকড়ে পোকা ধরিয়াছে, যে মাটি হইতে বাঁচিবার খাদ্য পাইবে সেই মাটি পাথরের মতন কঠিন হইয়া গিয়াছে ; যে গ্রাম সমাজ জাতির জন্মভূমি ও আশ্রয় স্থান তাহার সমস্ত ব্যবস্থা বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে ; এখন সে ছিন্নমূল বৃক্ষের মত নবীন কালের নির্দ্দয় বন্যার মুখে ভাসিয়া যাইতেছে।

দেশের মধ্যে পরিবর্ত্তন বাহির হইতে আসিলে পুরাতন আশ্রয়টা যখন অব্যবহারে ভাঙ্গিয়া পড়ে, এবং নূতন কালের উপযোগী কোনো নূতন ব্যবস্থাও গড়িয়া উঠে না, তখন সেইরূপ যুগান্ত কবলে বহুতর পুরাতন জাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরাও কি দিনে দিনে উদাস দৃষ্টির সম্মুখে স্বজাতিকে লুপ্ত হইতে দেখিব ? ম্যালেরিয়া, মারী, দুর্ভিক্ষ, এগুলি কি আকস্মিক ? এগুলি কি আমাদের সান্নিপাতিকের মজ্জাগত দুর্লক্ষণ নহে ? সকলের চেয়ে ভয়ানক দুর্লক্ষণ সমগ্র দেশের হৃদয় নিহিত হতাশ নিশ্চেষ্টতা। কিছুরই যে প্রতিকার আমাদের নিজের হাতে আছে, কোনো ব্যবস্থাই যে আমরা নিজে করিতে পারি, সেই বিশ্বাস যখন চলিয়া যায়, যখন কোনো জাতি কেবল করুণ ভাবে ললাটে করস্পর্শ করে ও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আকাশের দিকে তাকায়, তখন কোনো সামান্য আক্রমণও সে আর সহিতে পারে না ; প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষত দেখিতে দেখিতে তাহার পক্ষে বিষক্ষত হইয়া উঠে। তখন সে মরিলাম মনে করিয়াই মরিতে থাকে।"*

* পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী উপলক্ষে অভিভাষণ।

তখন দেশের লোক তাঁর কথা শুনলেও হাতে-কলমে কোনো কাজে কেউ প্রবৃত্ত হল না। তারপর মিণ্টো-মর্লি রিফম্ দেশ খুসী হয়ে একেবারে ঠাণ্ডা হিম হ'য়ে গেল। তারপর এল আর এক দফা শাসন সংস্কারের ব্যবস্থা। সে ব্যবস্থায় অনেক-কিছুর সৃষ্টি হল, কিন্তু হ'ল না জাতীয় জীবনের আসল ভিত্তিকে গড়ে তোলা। আজ যদি আবার একটু সাড়া পড়েছে তবে আমাদের সমস্ত চেষ্টা পল্লী-সমাজের পুনর্গঠনে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। পল্লীর প্রাণটা জাগিয়ে তোলা দরকার; জীবনীশক্তির প্রকৃত স্পন্দন যদি জাগে, তবে আপনাআপনি বহুদিন সঞ্চিত আবর্জ্জনা দূর হয়ে যাবে। পল্লী সংস্কারের কথা উঠ্‌লেই কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের নাম শোনা যায়,—একটা পাঠশালা বসান যাক, অথবা সমবায় সমিতি দু'একটা পত্তন করা যাক; কেউবা বলেন একটু কম সুদে টাকা পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা হোক্, ইত্যাদি নানা প্রস্তাব ওঠে। এ-সব উত্তম কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু পল্লী-সমাজের প্রাণটা যদি না জাগে, তবে এ সমস্তই ব্যর্থ হবে। গভর্ণমেণ্টের চেষ্টায় দেশের নানা স্থানে যৌথ-ঋণদান সমিতি স্থাপিত হ'য়েছে; যারা সমিতির সভ্য তাদের টাকাকড়ি কর্জ্জ পাওয়া সম্বন্ধে কিছু সুবিধা হয়েছে; কিন্তু পল্লীবাসী কয়েকজন মিলিত হ'লে যে-সব অনুষ্ঠানের আয়োজন হবে বলে আশা করা যেতে পারে, তার তেমন কোন উদ্যোগ দেখ্‌ছিনে। সর্‌কার পক্ষ সমবায় ব্যাঙ্ক খুলে দিয়েছে, গ্রামের জন কয়েক প্রজা তার সভ্য, ব্যাঙ্কের কাজ চল্‌ছে কিনা দেখ্‌বার জন্য ইন্‌স্‌পেক্টর, অডিটার, ডিরেক্টার ও রেজিষ্ট্রার আসেন; তাঁরা পরিদর্শন করে চলে যান।

আমি সরকারী ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোনো অভিযোগ উপস্থিত করছিনে—তাদের এই কাজ, তাদের কাজের এই রীতি। আমি বল্‌ছি, যে পল্লীসমাজের হৃদয়টা যদি উদ্বোধিত না হয়, তবে বাইরের আড়ম্বর আয়োজন যতই বিপুল হোক না কেন, তাতে কোন সুফল ফল্‌বে না। আর, হৃদয়টাকে জাগাবার কাজ আমাদেরই কর্‌তে হবে—এ কাজ গভর্ণমেন্টকে দিয়ে হবে না। আয়র্ল্যাণ্ড্ সম্বন্ধে কবি এই বিষয়ে কি বল্‌ছেন একটু উদ্ধৃত কর্‌ছি। তাঁর এই কথা অক্ষরে অক্ষরে আমাদের দেশ সম্বন্ধে খাটে। তিনি বল্‌ছেন—

"We can build up a rural civilization in Ireland, shaping it to our hearts' desires warming it with life, but our rulers and officials can never be warmer than a step-father, and have no large, divine, and comfortable words' for us; they tinker at the

body when it is the soul which requires to be healed and made whole. The soul of Ireland has to be kindled, and it can be only kindled by the thought of great deeds and not by the hope of petty parsimonies or petty gains."

ভাবার্থ:—'আয়ার্ল্যাণ্ডে আমরা আমাদের মনস্কামনার অনুরূপ করে এক প্রাণবান্ পল্লী-সভ্যতা গ'ড়ে তুল্‌তে পারি, কিন্তু সে কাজে আমাদের শাসক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বেশী সহানুভূতি ও সাহায্য আমরা যেন না আশা করি। ওরা শরীরটাকে নিয়ে আছে ; অসুখ যে মনের, ঐ যায়গাটায় যে চিকিৎসা আগে দরকার তা তারা জানে না। আয়ার্ল্যাণ্ডের মনকে, তার আত্মাকে, আমাদের জাগাতে হবে। এ কাজ খেলো লাভালাভের হিসেব খতিয়ে হবে না, এ জন্য বৃহত্তর কাজের চিন্তা চাই ; জাতীয় মনকে এমন করেই উদ্বোধিত করতে হবে।"

আমাদের কবিও বলেছিলেন সেই স্বদেশী আন্দোলনের দিনে—

* * * * * * "একথা একবার ভাবিয়া দেখ, মাতাকে তাহার সন্তানের সেবা হইতে মুক্তি দিয়া সেই কার্য্য ভার যদি অন্যে গ্রহণ করে, তবে মাতার পক্ষে তাহা অসহ্য হয়। ইহার কারণ, সন্তানের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহই তাহার সন্তান সেবার আশ্রয় স্থল। দেশ হিতৈষিতারও যথার্থ লক্ষণ দেশের হিত কর্ম্ম আগ্রহপূর্ব্বক নিজের হাতে লইবার চেষ্টা। দেশের সেবা বিদেশীর হাতে চালাইবার চাতুরী, যথার্থ প্রীতির চিহ্ন নহে ; তাহাকে যথার্থ বুদ্ধির লক্ষণ বলিয়াও স্বীকার করিতে পারি না। কারণ এরূপ চেষ্টা কখনই সফল হইবার নহে।" * * * *

আয়ার্ল্যাণ্ডে যাঁরা পল্লীসংস্কারের কাজে ব্রতী হয়েছেন, তাঁরা দেশ হিতকর নানা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীর চিত্ত উদ্বোধিত করার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন ; আমাদেরও দিতে হবে। কেমন ক'রে বাংলা দেশের পল্লীসমাজকে জাগান যায় এই হচ্চে প্রশ্ন।

প্রথম কথা যাঁরা একাজে হাত দেবেন, তাঁদের মন যেন কোনো প্রকার সংশয়ের কুয়াসায় আচ্ছন্ন না হয়। তাঁরা যেন এর সফলতার সম্ভাবনার প্রতি সন্দিহান না হন। সমস্যা খুবই কঠিন, এর মীমাংসা এক দিনে হবে না। আজ যত দুর্লক্ষণ দেখ্‌তে পারছি তা' কখনই চিরন্তন নয়, এই বিশ্বাস আমাদের মনকে উদ্বোধিত করুক। বহু কালের সঞ্চিত দুর্গতি দূর করতে সাধনা ও শক্তি চাই ; যাঁরা পল্লীসমাজ পুনর্গঠনের কাজ হাতে নেবেন, তাঁরা

* সফলতা সদুপায়—১৩১১—রবীন্দ্রনাথ।

কিছুতেই নিরাশ হ'তে পার্‌বেন না। "হবে না" এ কথা তাঁরা কিছুতেই মান্‌বেন না; তাঁদের মন্ত্র "হবে জয়, হবে জয়, হবে জয়।" নিজেদের ও জাতীয় শক্তির উপর অবিশ্বাসই আমাদের কর্ম্মচেষ্টাকে সংকীর্ণ করে. আমরা বড় ক'রে কোনো সমস্যার মীমাংসার পথ ভাব্‌তে পারি নে। কোনো কোনো পল্লীতে কাজের পত্তন ক'রতে গিয়ে গ্রামস্থ প্রবীণদের কাছে এই উপদেশই পেয়েছি—"ও-সব এ গাঁয়ে হ'বার জো নেই।" তাঁদের অনেকের মুখে একথা শুনতে আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হই নি, কিন্তু যখন সেইসব পল্লীর যুবকদলের মধ্য থেকে কেউ কেউ প্রবীণদের সুরে সুর দিলেন তখন আমার দুঃখ হল।

দ্বিতীয়তঃ, যাদের অস্পৃশ্য বলে দূরে রেখেছি তাদের বাদ দিয়ে আমরা পল্লীসমাজ পুনর্গঠন ক'রব এমন অসম্ভব কথা যেন আমরা মনেও স্থান না দেই। যে-সব কারণে পল্লীসমাজ দুর্গতির চরম সীমায় এসে পৌঁছেছে, তার একটা প্রধান কারণ, এই ধর্ম্মহীন আচার,—যাতে মানুষকে দূরে রাখে, তাকে ঘৃণা করে, তাকে অপমান করতে সঙ্কোচ মাত্র বোধ করে না। আমাদের জাতীয়-জীবনের এই ব্যাধিই আমাদের দুর্ব্বল ক'রেছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। বাঙ্গালা দেশে ২১০ লক্ষ হিন্দুর বাস; তার মধ্যে ব্রাহ্মণ ১২॥০ লক্ষ, কায়স্থ ১১ লক্ষ ও বৈদ্য ৮৯ হাজার। এই ক'টা জাতকে আমরা ভাল জাত বলি। তারপর এক শ্রেণী আছে, যাদের "জলচল" বলা যেতে পারে, অর্থাৎ তাদের ছোঁয়া জল বামুনও খেতে পারে। তারা হচ্ছে তিলি, তাঁতি, কৈবর্ত্ত, সদ্‌গোপ্ প্রভৃতি। এই স্তরের নীচে যে বিপুল জনসংখ্যা, তারা হিন্দু বটে, কিন্তু অস্পৃশ্য! এই অস্পৃশ্যেরাই চাষ-বাস করে, ক্ষেতে ফসল জন্মায়; আর এই কৃষক সম্প্রদায়কেই যদি আমরা পল্লীসমাজ থেকে "পারিয়া" ব'লে বাদ দি, তবে কাদের নিয়ে সমাজ গড়া যেতে পারে? আমি জানি এ কথায় অনেকে অন্তরের সঙ্গে সায় দিতে পারবেন না; কিন্তু আমার এই নিবেদন, মনকে শিক্ষাগত নানা সংস্কার থেকে মুক্ত রেখেই জাতীয় সমস্যার কথাটা ভাবা দরকার। আজ আমরা রাজনৈতিক স্বরাজের জন্য হাত বাড়িয়েছি; কিন্তু সামাজিক এ মহাব্যাধি ভারতবর্ষের সমস্ত অঙ্গকে যে শিথিল করে রেখেছে, তার প্রতিকার কর্‌বার জন্য কি সচেষ্ট হব না? যদি এই ব্যাধি মুক্তই না হলাম, তবে "স্বরাজ" দিয়ে কি কর্‌বো?

আমাদের দেশের যে বিপুল জনসংখ্যাকে আমরা নিম্নশ্রেণী বলে দূরে রেখেছি, আয়ার্ল্যাণ্ডে তেমন কোনো সমস্যার উদয় হয় নি বটে, কিন্তু তবু সেখানে এক শ্রেণীর লোক আছে যাদের অবস্থা হীন। কবি এ-ই তাদের কথা বল্‌তে গিয়ে লিখ্‌ছেন——* * * "Our conception of a civilization

must include, nay, must begin with the life of the humblest, the life of the average man or manual worker; for if we neglect them, we will build in sand. The neglected classes will wreck our civilization." * * *

ভাবার্থঃ—আমাদের এই সভ্যতা-গড়ার সঙ্কল্পের সাধনায় আমাদের দেশের ছোট-লোকদের, কুলি-মজুরদের কেবল যে মনে রাখ্‌তে হবে তা নয়, তাদের নিয়েই এই সভ্যতার গোড়া পত্তন কর্‌তে হবে। তাদের ছেড়ে আমরা যাই গড়্‌ব, তা নেহাৎ 'তাসের' ঘর হবে। অবজ্ঞাত শ্রেণীরা আমাদের সেই সভ্যতাকে ভেঙ্গে উড়িয়ে দেবে।"

এমন কে আছেন যিনি উপরের এই কথা কয়েকটার প্রতিবাদ ক'র্‌তে পারেন? অস্পৃশ্য বলে মানুষকে তুচ্ছ করেছিলাম, সেই অপরাধেই না ব্রাহ্মণ তার সম্মান হারিয়েছে, ক্ষত্রিয় তার বীর্য্য হারিয়েছে, বৈশ্য তার ব্যবসা হারিয়েছে; আর, সমস্ত সমাজ চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে গেছে, চিরলাঞ্ছিত কোটি কোটি অস্পৃশ্য ভারতবাসীর নীরব দুঃখে ব্যথিত জীবনদেবতার অভিসম্পাতে। আজ যদি আমাদের মনে স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা জেগে থাকে, তবে সামাজিক বিধিবিধানের আটঘাটে যে-সব অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে আস্‌ছি, সর্ব্বাগ্রে তার প্রতীকার করি। সবার নীচে যারা পড়ে আছে তাদের হাতে ধ'রে না তুল্‌লে আমরা ঐক্যবদ্ধ জাতি হ'য়ে দাঁড়াব কেমন ক'রে? অতএব, মানুষে মানুষে যে ব্যবধান এখন র'য়েছে, পল্লীসংস্কারের কাজ ক'র্‌তে গিয়ে এই ব্যবধান দূর ক'র্‌তে হবে।

তৃতীয়তঃ, পল্লীসংস্কারের কাজে যাঁরা ব্রতী হবেন, রাজনৈতিক আন্দোলন এবং আস্ফালন থেকে তাঁদের একটু দূরে থাকাই শ্রেয়। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে, হৈ চৈ করে এসব কাজ হয় না। সৃষ্টির কাজ চলে লোক চক্ষুর অন্তরালে। পল্লীবাসীর মনে স্বদেশপ্রীতি সঞ্চার করে তাদের ভিতরে উদ্দীপনা এনে দেবার পথ অন্য। যাঁরা সরল অন্তঃকরণে এসব কাজে হাত দেবেন, তাঁদের চোখের সাম্‌নে পথ দেখা দেবেই; আর যদি শোভাযাত্রা করে আমরা রাতারাতি একাজ করতে যাই, তবে হয়ত পথের ধূলা উড়িয়ে পথ দেখ্‌তে পাবার অসুবিধা ঘটবে। তা ছাড়া, রাজনৈতিক আন্দোলনের আবর্ত্তে পড়লে তখন দলাদলির নেশায় আমাদের পেয়ে বসে। কোন্ পথ অবলম্বন করে কত দিনে আমরা রাষ্ট্রীয় অধিকার পাব, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ থাক্‌লেও পল্লীসংস্কারের কাজে সকল দলেরই সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। এ কাজে মডারেট এক্‌ষ্ট্রীমিষ্ট্‌ নন-কো-অপারেসনিষ্ট সকলেই যোগ দেবে। আমাদের কাজ হবে যারা সবার

নীচে পড়ে' আছে তাদের নিয়ে; আমাদের কাজ ক্ষেতে, সেখানে চাষী চাষ করে; আমাদের কাজ, হাড়ী-বাগ্‌দী, ডোম-চামার প্রভৃতি জাতের উন্নতির পথ অবরোধ না করা—এ কথা বুঝতে দেওয়া যে তাদের বাদ দিয়ে আমাদের জাতীয় জীবন গড়া সম্ভব নয়।

আবার আয়ার্ল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত দিচ্চি। ১৮৮৯ সালে আয়ার্ল্যাণ্ডের একজন কর্ম্মবীর স্যার হোরেস্ প্লান্‌কেট আমেরিকা থেকে ফিরে এসে তাঁর স্বদেশে সমবায় প্রণালী অবলম্বন ক'রে কৃষিজীবিদের উন্নতিসাধন কর্‌বার আয়োজন করতে লাগ্‌লেন; তিনি কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের লোক ছিলেন না ব'লে, তাঁর এই আয়োজনে বিভিন্ন দলের লোক সাড়া দিয়েছিল। ক্যাথলিক্, প্রোটেষ্টাণ্ট, য়ুনিয়নিষ্ট্, ন্যাশন্যালিষ্ট্ সবাই এক সঙ্গে কাজ করেছে; অরেঞ্জম্যান্ ফেনিয়ানের সঙ্গে বসে' পল্লী-সমাজ সংস্কারের পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছে।

আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক দলের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এ কাজে যোগ দিতে হবে। রাজনৈতিক মতামত যাই থাক না কেন, পল্লীসংস্কারের কাজে আমরা এক মত হতে পারি। যেখানে আমাদের কিছু গড়্‌তে হবে, জীর্ণ পল্লীগুলির সংস্কার কর্‌তে হবে, সেখানে রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্কের সূক্ষ্ম বিচার না-ইবা কর্‌লাম। তারপর পল্লী-সমাজের হৃদয়টা যদি সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে, যদি এর মধ্যে চেতনার লক্ষণ দেখা দেয়, তবে আপনা হতেই তার বিকাশের পথে যত অন্তরায় যে ভাঙ্গ্‌তে চাইবে। গোষ্ঠী-জীবনের সৃষ্টি হ'লে তার দাবী দাওয়া সে জোর করে জাহির কর্‌বেই; আর, সে-চাওয়ার পিছনে জনশক্তির সঙ্ঘবদ্ধ ইচ্ছা (Collective Will) থাক্‌বে ব'লে, কোনো রাষ্ট্রশক্তি তাকে দীর্ঘকাল অগ্রাহ্য ক'র্‌তে পার্‌বে না।

চতুর্থতঃ, যাঁরা পল্লী-সমাজের পুনর্গঠনের কাজে হাত দিবেন, তাঁদের সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। স্বদেশী আন্দোলনের সুরু থেকেই পল্লীর দিকে কারো কারো দৃষ্টি পড়েছিল; কাজ কর্‌বার উৎসাহ নিয়ে অনেকে সহরের সমস্ত আকর্ষণ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে পাড়াগাঁয়ে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন; এমন কি, বাঙ্গালা দেশের কোনো জমিদার প্রজা-হিত কর্‌বার সঙ্কল্প করে দু'-একজন 'ভলান্টিয়র'কে খাওয়া-পরা দিয়ে নিজেদের এষ্টেটে নিযুক্ত করেছিলেন। দু'-চার মাস পরে দেখা গেল এমন ব্যবস্থায় কোনো ফল হ'তে পারে না; তার একটা কারণ পল্লী-সংস্কারের সমস্যাগুলি যে কি তা' কর্ম্মীদের মনে উদয় হয় নি। কাজ কর্‌ব মনে কর্‌লেই কাজ করা যায় না। সে জন্য শিক্ষা-দীক্ষা প্রয়োজন; নিজেদের মনে এমন সঙ্কল্প জাগান চাই, যার

শক্তি কর্ম্মীকে কিছুতেই পিছপাও হ'তে দেবে না। কর্ম্মীদের মধ্যে জীবনী-শক্তির প্রাচুর্য্য থাকলেই অর্দ্ধমৃত পল্লীসমাজে তাঁরা প্রাণ সঞ্চার কর্‌তে পারবেন। "Life draws life itself"—জীবন জীবনটাকে টানে। আমি জানি অনেকে ব'ল্‌বেন, গভর্ণমেণ্ট আমাদের বাধা দেবে, সি-আই-ডি আমাদের ওতপ্রোতভাবে ঘিরে থাক্‌বে, আমাদের কাজে স্বাধীনতা থাক্‌বে না।" কিন্তু এর উত্তরে আমি ব'লব—বাহিরের বাধা তত দুরতিক্রম্য নয়, ভিতরের বহু বাধা-বিঘ্ন যেমন। এমন করে কাজের পদ্ধতি করা যেতে পারে, যাতে রাজপুরুষদের মন উত্তেজিত না হয়, সি-আই-ডির অনুচরেরাও গোপনীয় কোনো ষড়যন্ত্রের সন্ধান পেয়ে উল্লসিত না হ'তে পারে।

আসল কথা, আমাদের মন এখনও এই কাজের দিকে পুরোপুরি আকৃষ্ট হয় নি। আমরা রাজনীতির হুজুগ ছেড়ে এসব কাজে হাত দিতে রাজি নই। কিন্তু একথা খুবই সত্য, যত দিন পর্য্যন্ত না এই দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে, তত দিন কল্যাণ নাই। রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে রাজশক্তির ভাণ্ডার থেকে কিছু কিছু বক্‌সিস্ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু যাদের নিয়ে ভারতীয় সভ্যতার ভিত আবার গাঁথ্‌তে হবে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে, তাদের হাত ধরে তুলবার সাধনা ভিন্ন আমাদের মুক্তি নাই। যদি আমরা দেশের প্রকৃত কল্যাণ কামনা করি, তবে কেমন করে' কোন প্রণালী অবলম্বন করে' পল্লীগুলী গড়ে উঠ্‌তে পারে সেই কথা আমাদের ভাবতে হবে! বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে শিবের পূজা হয়, কিন্তু রাশিকৃত বেলপাতা ও ফুল আর কলসী কলসী গঙ্গাজলে শিবের পূজা হয় না। যিনি শিবম্, যিনি মঙ্গলদাতা—তাঁর পূজা হয় মঙ্গলানুষ্ঠানের দ্বারা। শিবের পূজা মিথ্যা হ'চ্চে ব'লে এত আয়োজন সত্বেও বাঙ্গলার পল্লীতে মঙ্গলের কোনো চিহ্ন দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। এবার এ পূজাকে সত্য করে' তুল্‌তে হবে। আজ যে সমস্ত দেশে উত্তেজনার হাওয়া বইচে, এ হ'চ্চে কালবৈশাখীর পূর্ব্ব লক্ষণ। যদি সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হ'তে না চাই, তবে এইবার যথার্থ শিবের পূজায় নিজেদের প্রবৃত্ত করি, আর অন্য পথ নেই।

তৃতীয় প্রস্তাব

কোন্ প্রণালী অবলম্বন করে' আমাদের গ্রামগুলোকে গড়ে' তোলা যাবে, এই নিয়ে কথা উঠলো। যদি পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায় কেউ কেউ তাতে আপত্তি করেন; অনেকে এমনকি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন। তাঁরা বলেন, ভারতীয় সভ্যতার আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন; অতএব, অপর কোনো সভ্যতার মাপকাঠিতে একে বিচার করা ভুল ও সেই অনুসারে কোনো সংস্কারের কাজে হাত দিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। অনুকরণের দ্বারা জাতীয় জীবনের কোনো অঙ্গেরই যথার্থ পুষ্টিসাধন হতে পারে না, এ কথা কে না স্বীকার কর্‌বে? বিশেষতঃ, যদি কোনো দেশের এমন দুর্ভাগ্য হয় যে তার রাষ্ট্রব্যবস্থা এক প্রবল জাতির হাতে গিয়ে পড়ে, তখন পরাভূত জাতি আর নিজেকে সাম্‌লাতে পারে না। প্রবল জাতির ধরণ-ধারণ রকম-সকম অনুকরণ কর্‌বার নেশা তখন সমস্ত দেশকে পেয়ে বসে। বিপদ এই, নকল কর্‌বার উৎসাহ ও উত্তেজনায় যাদের নকল কর্‌তে থাকি তাদের আসল প্রকৃতিটি আমাদের চোখে পড়ে না—চোখে পড়ে তাদের বাইরের সাজ-সরঞ্জাম ও জাল-জঞ্জাল। হ্যাট্‌কোট্ পর্‌লে অনেক বাঙ্গালীর মুখ দিয়ে যে ধরণের ভাষা ও ভাবভঙ্গি প্রকাশ পায়, তার দৃষ্টান্ত পথে-ঘাটে সহজেই চোখে পড়ে। রাশিয়ার উপর য়ুরোপীয় অন্যান্য দেশের প্রভাব বিস্তৃত হতে থাক্‌লে তার অবস্থা কি রকম হয়ে দাঁড়াল সে বিষয়ে মহাত্মা ষ্টেপ্‌নিয়াক আলোচনা কর্‌তে গিয়ে বলেছেন—

"In social and political life, as well as in the domain of art and fiction, imitations seem always to bear the same original sin : while reproducing with great fidelity the drawbacks, imitators ignore and forget the merits of their exemplars."

ভাবার্থ :—সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনেই হোক আর শিল্পকলা ও সাহিত্যেই হোক্ অনুকরণ কর্‌তে গিয়ে এক বিশেষ ত্রুটির চিহ্ন থেকে যায় —সেটা হচ্ছে, যাদের অনুকরণ করি তাহাদের যথার্থ প্রকৃতি ও গুণ আমরা উপেক্ষা করি আর সুধু নকল করি তাদের দোষ-ত্রুটি।

কোনো বিদেশীয় সভ্যতার সত্যটুকু গ্রহণ কর্‌তে না পারার কারণ জাতীয় দুর্ব্বলতা। এক দিকে আমরা ভারতীয় সভ্যতার সত্য মূর্ত্তির সঙ্গে অপরিচিত, আবার যাদের সঙ্গে আমাদের ঐতিহাসিক সম্বন্ধ হ'ল তাদের সত্য পরিচয়টাও আমরা পাই নি। তাই সামঞ্জস্য হ'ল না—হ'ল বিরোধের সৃষ্টি। তাই এমন কথাও শোনা যাচ্ছে যে পৃথিবীর অপর সভ্যতার ছাপ বা ছায়া এদেশের সর্ব্বাঙ্গ থেকে মুছে ফেল। যাকে সত্যভাবে গ্রহণ কর্‌তে পারি নি, তাকে অনাবশ্যক উৎপাত মনে করে' বর্জ্জন করার মধ্যে যে দুর্ব্বলতা আছে, আজ আমরা এ কথা স্বীকার কর্‌তে রাজি নই!

সভ্যতা গড়ে' উঠেছে মানুষকে নিয়ে। নানা দেশে নানা অবস্থার মধ্যে যে পথ ও পাথেয় নিয়ে মানুষ তার সকল সমস্যার সমাধান করেছে ও কর্‌ছে, আমরা সেই অভিজ্ঞতার সুযোগ থেকে নিজেদের কেন বঞ্চিত করব? আজ যারা রাষ্ট্রনীতি নিয়ে দেশে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছেন তাঁদের মধ্যে এক দল আমাদের জাতীয় সমস্যার মীমাংসার পথ নির্দ্দেশ কর্‌তে গিয়ে এমন সব কথা বলেন যেন ভারতবর্ষ সমস্ত দুনিয়ার বাইরে একটা freak, খাপছাড়া সৃষ্টিছাড়া; এখানকার বিধি-ব্যবস্থায় যেন বিশ্ব-নিয়ম খাটে না; যেন আমরা ব্রহ্মার বিশেষ সৃষ্টি, অতএব আমাদের শাস্ত্র ও অস্ত্র সমস্তই এমন এক আদর্শে গঠিত যে তার সঙ্গে পৃথিবীর কোনো শাস্ত্র ও অস্ত্রের মিল নেই।

কিন্তু বিশেষ সৃষ্টি মান্‌বার যুগ অস্ত গেছে। বিশ্বমানবের যাত্রাপথে আমরাও যাত্রী; অতএব আমাদের দৃষ্টিকে সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ রেখে আমরা পথ চল্‌তে পার্‌ব না। এতকাল আমরা এক-ঘরে হয়েই ত পড়ে' ছিলাম। স্বরাজের ভিত্তি স্থাপনের দিনে আমাদের সে-দৈন্য ঘুচে যাক; আমরা বিশ্বমানবের ভিতর থেকে স্বরাজ গড়্‌বার আবশ্যকীয় মাল-মসলা সংগ্রহ করি; এমন কথা যেন বলি নে যে ঐ ভাণ্ডারের সামগ্রী ও সাজ-সরঞ্জামে আমাদের প্রয়োজন নেই।

তাই বলে' আপনারা মনে কর্‌বেন না আমি ভারতীয় সভ্যতার বিশেষ প্রকৃতি ও ধারা রক্ষা কর্‌তে বল্‌ছি নে। গড়্‌বার ছাঁচ (design) স্বতন্ত্র ত হবেই। এই বিশিষ্টতা না রাখ্‌লে আমরা কিসের উপর ভর করে' দাঁড়াব? রাষ্ট্রই হোক্ আর সমাজই হোক্, তা কোনো জাতির অন্তর্নিহিত

শক্তিকে প্রকাশ করবার অবলম্বন মাত্র। এই প্রকাশে বৈচিত্র্যের অন্ত নেই; কিন্তু এর মধ্যে বিশ্বমানবের অখণ্ড নিয়ম কাজ করছে বলে' সহস্র বিভিন্নতা সত্ত্বেও ঐক্য-সূত্র একের সঙ্গে অপরের যোগ রক্ষা করছে। এই ঐক্য-সূত্র উপেক্ষা করবার আশঙ্কা হয়েছে বলে'ই আজ এসব কথা বলা প্রয়োজন।

কিছু দিন পূর্ব্বে 'কৃষি উন্নতির দৃষ্টান্ত' নাম দিয়ে কতকগুলি প্রবন্ধ আমি তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকায় লিখেছিলাম। তার মধ্যে আয়ার্ল্যাণ্ডের কথাই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছিলাম; কেননা সেখানকার কৃষকদের অবস্থার সঙ্গে আমাদের কিছু সাদৃশ্য আছে। স্বার্থপর জমিদার, সুদখোর মহাজন ও দয়ামায়াহীন পাইকার সকলেই আইরিশ কৃষকের পরিশ্রম-জাত ফসল নিয়ে ব্যবসার ফাঁদ পেতে বসে। কৃষক সারা বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেও সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারে না, আর এইসব পরগাছা দিব্যি আরামে জীবন যাপন করে। এর প্রতীকার হয়েছিল কেমন করে? সমবায়ের দ্বারা। কর্ম্মবীর স্যার হোরে প্ল্যাঙ্কেটের উদ্যোগে এক দল যুবক সমবায় ব্যবস্থার পত্তন করে কৃষকদের অশেষ কল্যাণ করেছেন। আজ তারা স্বাবলম্বী, নির্ভীক ও অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এমন কথা কতবার শুনেছি যে হোরেস্ প্ল্যাঙ্কেটের পদ্ধতি এ দেশে খাটবে না। অনেকে গভর্ণমেণ্ট-পরিচালিত সমবায় সংস্থাপনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে' বলেছেন যে, কৃষকেরা এখনও এসে জোটে নি, তাদের আকর্ষণ করতে পারে সমবায়-ব্যবস্থার মধ্যে এমন কিছু নেই; কেন নেই, এই বিষয় অনুসন্ধান না করে' যদি এমন কথা শোনা যায় যে ঐ প্রণালীটাই এ দেশের পক্ষে অনুপযোগী, তখন বল্‌তেই হয় যে আমরা দেশের প্রকৃত অবস্থা জানি নে, জান্‌তে চাই নে। বাংলাদেশে পল্লীসমাজের জীবনযাত্রার অনেক পর্ব্ব সুসম্পন্ন হয় জোট বেঁধে। পূজা-পার্ব্বণ থেকে গাই গরু, ফসল কেনা বেচা পর্য্যন্ত অনেক কাজে পল্লীবাসীরা পরস্পরকে সাহায্য করে' থাকে। এই জন্য মনে হয়, সমবায়-প্রণালী এ দেশেও চল্‌বে; কিন্তু যদি কেবলমাত্র বিশেষ কোনো আইন-কানুনের সীমার মধ্যে এর বিস্তার বদ্ধ রাখা হয়, তবে তাতে বিশেষ ফল হবে না। কৃষকের ঋণভার লাঘব করবার আয়োজন করা চাই; যাতে তার পরিশ্রমলব্ধ জিনিষপত্র বা ফসল বিক্রী করে' ষোল আনা পয়সা তারই হাতে থাকে এর ব্যবস্থা করা চাই; তার চাষবাস যাতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে হ'তে পারে এমন উপায় উদ্ভাবন করা চাই; এই-সব কাজই হচ্চে সমবায়-প্রণালীর অন্তর্ভূত; কিন্তু সব চেয়ে বড় কাজ পল্লীবাসীর অন্তরের দিক থেকে তাকে সচেতন করে' তোলা। তার জ্ঞান-বুদ্ধির উন্মেষ হ'লে জীবনের সঙ্কীর্ণতা

আপনা হতেই ঘুচে যাবে ; তখন সে দশের সঙ্গে মিলে পল্লীর শিক্ষা স্বাস্থ্য ও ব্যবসার উন্নতি কর্‌বার জন্য সচেষ্ট হবেই। এই উন্নতি সাধনের জন্য আমাদের বৈজ্ঞানিক চর্চ্চা কর্‌তে হবে ; বিংশতি শতাব্দী জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে যা কিছু প্রয়োজন আমরা আহরণ কর্‌ব।

কথা উঠেছে, কল্-কারখানা আমরা চাইনে ; কেউ কেউ বলেন বৈজ্ঞানিক সাজ-সরঞ্জামে আমাদের প্রয়োজন নেই ; কেননা ওগুলো হচ্ছে জড়বাদীর যন্ত্রপাতি। য়ুরোপীয় কারখানার দৃষ্টান্ত দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে কলকব্জার বিপুল আয়োজনে মানুষকে পিষেই মারে ; এতে মানুষের দুর্গতি বেড়েছে বই কমে নি।। কিন্তু এর জন্য বৈজ্ঞানিক সত্যলব্ধ মেশিনগুলোকে দোষী কর্‌লে চল্‌বে না। মেশিনগুলোর ব্যবহারের উপর ভাল-মন্দ নির্ভর করে। য়েরোপ্লেনের সাহায্যে এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের যোগ রক্ষা করা সুবিধাজনক, এ-দ্বারা প্রভূত কল্যাণ সাধিত হ'তে পারে ; আবার, এর সাহায্যে বোমা ছুড়ে লোকের বস্‌তি উজাড় করে' দেওয়া অতি সহজ। রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্যে মানুষের কত প্রয়োজনই না মিটল ; আবার এরই তত্ত্ব অবলম্বন করে' মানুষ মানুষকে বিষ দিয়ে মার্‌বার নানা উপায় আবিষ্কার করেছে। হাতে লাঠিগাছা থাক্‌লে আত্মরক্ষার কাজে আসে, কিন্তু ক্রোধাবিষ্ট হ'লে আমি আমার পরমাত্মীয়ের পিঠেও এর ব্যবহার কর্‌তে পারি। এ-ক্ষেত্রে লাঠিগাছাকে দোষী করা চলে না।

আসল কথা যন্ত্রপাতি কল-কার্‌খানা অস্ত্র-শস্ত্র এমন কি বিদ্যা-বুদ্ধি সমস্তই অনর্থ সৃষ্টি কর্‌তে পারে যদি মানুষ এর ব্যবহারকে সমগ্র সামাজিক জীবনের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত নিয়ন্ত্রিত না করে। সেদিন একজন ইংরেজ লেখকের লেখা পড়্‌লুম ; তিনি বল্‌ছেন,

"We are not materialists, because we understand machines. We are materialists because we use them in a predatory unsocial way to heap up wealth for the few at the expense and the privation and degradation of the many."

ভাবার্থ :—আমরা কলকার্‌খানা পরিচালনা কর্‌তে ওস্তাদ বলে' আমরা জড়বাদী হ'য়ে পড়েছি তা নয়। এর সাহায্যে আমরা অপরের ধনদৌলত লুট করেছি ; সমাজের কল্যাণ চিন্তা না করে' কয়েক জনের ঘরে লুটকরা ধন জড় করেছি ; আর তার ফলে কত লোকের যে দুর্গতি হয়েছে, তার সীমা নেই ;—এই করি বলে'ই আমরা জড়বাদী।

আজ আমাদের প্রধান কাজ স্বরাজের ভিত্তি স্থাপন করা। তাই

বারম্বার এই কথা মনে রাখা দরকার যে আমাদের সমস্যা পৃথিবী-জোড়া সমস্যারই এক অংশ। তার মীমাংসা কেমন করে' হবে, সে পথ আমাদের চোখে পড়্‌বেই, যদি আমাদের বুদ্ধি সজাগ থাকে, যদি গ্রহণ ও বর্জ্জন কর্‌বার জীবনীশক্তির লীলা কোনো প্রকারে বাধাগ্রস্ত না হয়।

পল্লীসমাজ সংস্কারের প্রসঙ্গে পৃথিবী-জোড়া সমস্যার উল্লেখ কর্‌ছি শুনে আপনারা হয়ত মনে কর্‌ছেন আমি অবান্তর কথা বল্‌ছি। কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীর কোনো দেশের কোনো সমস্যাই বিচ্ছিন্নভাবে দেখ্‌লে চলে না। ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে মানুষ আর নিজেকে বদ্ধ রাখ্‌তে পারছে না; এই জন্য আজ আন্তর্জাতিক বহু প্রকার ব্যবস্থার আয়োজন দেখা দিয়েছে।

পৃথিবীর এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আমাদের যোগ আছে বলে'ই তার হিসেব মনে রেখে কাজে হাত দেওয়া দরকার। সুদূর আমেরিকার মাঠে তুলার ফসল ভাল হ'ল না, খবরটা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দেশ-দেশান্তরে পৌঁছিল; আর বোম্বাই সহরে তুলার বাজারে দাম চড়্‌ল। রাশিয়া চা কিন্‌লে না, আর আসামের চা-বাগানের কুলীদের ভাগে কম কাজ পড়্‌ল;— মালিকেরা স্থির কর্‌লেন অল্প করে' চা চয়ন কর্‌তে হবে। ইংলণ্ডের খনি-মজুরেরা নিজেদের দাবী জাহির কর্‌বার জন্যে ধর্ম্মঘট কর্‌ল—এ খবর আমাদের দেশের মজুরদের কানে পৌঁছতেই তারা সচেতন হ'য়ে উঠ্‌ল। আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে; কেবল মাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নয়, আমাদের বহুবিধ সমস্যার সঙ্গে বিশ্বমানবের সমস্যার সম্বন্ধ আছে; এ-কথা অস্বীকার কর্‌লে আমরা ভুল কর্‌ব। আজ আমরা পল্লী-গুলোকে গড়্‌বার কাজে হাত দিয়ে দেখ্‌ছি যারা কৃষক তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়; দেখ্‌ছি চাষবাসের ব্যবস্থায় কোনো শৃঙ্খলা নেই; কোনো বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করা হচ্চে না; গরু-বাছুরের ক্রমশঃই অবনতি হচ্চে। এই সমস্যার সঙ্গেও বাইরের যোগ আছে। পৃথিবীর হাট-বাজারে আমাদের ফসল চাই; সেখানের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে আমাদের ভাগে কম পড়ে' যায়। তাই ফসলের বৃদ্ধি যাতে হয় এমন উপায় করা দরকার। কৃষকদের ভাল বীজ ও উপযোগী সার বুঝিয়ে দেওয়া চাই; আর দশ গণ্ডা মহাজন ও পাইকারের হাত থেকে তাদের রক্ষা করা চাই। ভারতবর্ষের কৃষিসমস্যা আন্তর্জাতিক সমস্যারই অন্তর্ভূত; অতএব এই সমস্যা জটিল, এর সমাধান কর্‌তে হলে বিজ্ঞানের সহায়তা নিতে হবে; এ কথা বল্‌লে চল্‌বে না "এতকাল যেমন চল্‌ছিল, তাই ভাল।"

আজ দেশের লোকের মুখে এমন কথা শোনা যাচ্ছে বলে'ই পল্লী-সংস্কারের আলোচনা-প্রসঙ্গে এত কথা বল্‌তে হ'ল। উত্তেজনা ও উম্মাদনা আমাদের মনকে অধিকার করেছে বলে' আশঙ্কা হয় পাছে গড়্‌বার কাজে আমরা অধৈর্য্য হয়ে পড়ি। বুদ্ধিবৃত্তির অবাধ পরিচালনার দ্বারা জীবনে যে শক্তিসঞ্চার হয়, আমরা তারই সাহায্যে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করব; আর তা হ'লেই এক দিন স্বরাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

কবি এ-ই আয়ার্ল্যাণ্ডের কথা বল্‌তে গিয়ে লিখেছেন :—

"What we require more than men of action at present are scholars, economists, thinkers, educationalists, literateurs, who will populate the desert depths of national consciousness with real thought and turn the void into a fullness. We have few reserves of intellectual life to draw upon when we come to the mighty labour of nation-building."

ভাবার্থ :—কেজো লোকের চেয়েও এখন আমাদের প্রয়োজন হয়েছে এক দল চিন্তাশীল, ভাবুক, অর্থশাস্ত্রবিদ, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ও শিক্ষকের—যারা চিন্তার ধারা প্রবাহিত করে' জাতীয় জীবনের চিত্ত-মরুভূমি সরস করবে তার শূন্যতা পূর্ণ করে' দেবে। জাতটাকে গড়্‌তে গিয়ে দেখি মানসিক শক্তির ভাণ্ডারে বেশী কিছু সঞ্চিত নেই।

আয়র্ল্যাণ্ডে কবি এ-ই যে জিনিষের অভাব বোধ করেছেন, আমরাও আজ স্বরাজের ভিত্তি গড়্‌তে গিয়ে তাই উপলব্ধি কর্‌ছি। এই অভাব মিটছে না ব'লেই যাঁরা একটু-আধটু কাজে হাত দিয়েছেন তাঁদের মনে অসোয়াস্তি দেখা দিয়াছে। গড়্‌বার শক্তি অর্জ্জন না করে যাঁরা উত্তেজনার আবেগে পল্লীতে পল্লীতে ছুটেছিলেন, সেদিন শুনলুম তাঁরা ফিরে এসেছেন। ভেবে চিন্তে দেশের সাম্‌নে একটা বুদ্ধিসঙ্গত কর্ম্মপদ্ধতি ত কেউ দেন নি—দিয়েছেন হুকুম। তাই এবার আমাদের কোনো কাজে সফলতা লাভ হ'ল না।

কিন্তু দেশের মন আজ মুক্তির পথ খুঁজ্‌চে—কেবল দশ-পাঁচজন শিক্ষিত ভদ্রলোক নয়, দারিদ্র্য-পীড়িত লক্ষ লক্ষ দেশবাসী চাইছে মাথা তুলে দাঁড়াতে। এই নব জাগরণের দিনে পল্লীসংস্কার কর্‌বার সুযোগ হারালে আমাদের ভবিষ্যৎ আরো তিমিরাচ্ছন্ন হ'য়ে থাকবে। আজ প্রয়োজন এক দল কর্ম্মীর—যাঁরা নিজেদের অন্তরে স্বাধীনতার যথার্থ স্বরূপ অনুভব কর্‌ছেন, যাহা নিঃশব্দে পল্লীসমাজের জীর্ণ দেহে জীবনীশক্তির সঞ্চার কর্‌তে পারবেন; যাঁদের দৃষ্টি সত্যের দিকে, কেবল মাত্র সফলতার দিকে নয়। এমন কর্ম্মী হ'তে হলে ত

সাধনা চাই, শিক্ষা চাই। দেশের নানা স্থানে শিক্ষাকেন্দ্রে পল্লীসেবকের (rural workers) উপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থা করা দরকার।

যারা এ কাজে মন দিয়েছেন তাঁরা যেন এই মনে রাখেন যে পল্লী সমাজসংস্কার করা অতীব কঠিন কাজ। নানা কারণে আমাদের সমস্যা জটিল ; যদি এ'কে ছোট ক'রে বিচার করি তবে এই সমস্যার সত্য পরিচয় ত পাবই না, বরং বারম্বার ভুল করতে থাক্‌ব। এ কথাও মনে করা চল্‌বে না যে, পৃথিবীর অন্য কোনো জাতির কর্ম্মপদ্ধতি ও তার সফলতার দৃষ্টান্ত থেকে আমাদের কিছু শিখ্‌বার নেই।

চতুর্থ প্রস্তাব

লক্ষ্যের চেয়ে পথটাই যদি দেশের সমস্ত মন-প্রাণকে পেয়ে বসে তা' হলে যে সমস্যা দেখা দেয়, আজ আমাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। কোন্ পথ অবলম্বন কর্‌লে স্বরাজ লাভ সম্ভব হ'তে পারে, সহরে সহরে দেশ-সেবকদের বৈঠকে এই নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চল্‌চে। যতটুকু খবর পাই তা' পড়ে মনে হয় যে দেশটা রাজনৈতিক মুক্তির পথটাও যেন খুঁজে নিতে চায় না,—চায় কাটা ছাঁটা একটি নিয়ম (Formula)—একটি অব্যর্থ উপায়,—যার প্রয়োগমাত্র স্বাধীনতা লাভ সহজসাধ্য হবে। সহজ উপায়ে মুক্তির প্রয়াসী বলে' আমরা এ ক্ষেত্রেও গুরু খুঁজে বেড়াই, আর যদি গুরু ক্ষণকালের জন্যও চোখের আড়াল হ'ন্, তখন তাঁর মুখের কথাকেই সার কথা জেনে আমরা স্বাধীন চিন্তার প্রয়োজনও বোধ করি নে। একদল দেশ-সেবী স্থির করেছেন, ভারতবর্ষের মুক্তির মন্ত্র হচ্চে 'খদ্দর'; অতএব এই মন্ত্রবীজটি ছড়ানই হচ্চে এখন কাজ।

জালিনওয়ালাবাগের দুর্ঘটনার পর আন্দোলনে উত্তেজনায় জেলখানাকে 'স্বরাজ-আশ্রম' নাম দিয়ে যারা জেলে ঢুকেছিলেন, তারা বাইরে এসে দেখেন,—উত্তেজনা থেমে গেছে, যে-সব বৃহৎ আয়োজনের পত্তন করা হবে

এমন আশা ছিল, তার কিছুই বিশেষ করা হয় নি। সমস্ত দেশটা যেন আবার ঝিমুচ্চে, আর তাকে সচেতন রাখ্‌বার জন্য এক দল কর্ম্মী থেকে থেকে চীৎকার করে' উঠছেন—"খদ্দর পর"।

তারপর, এই স্বরাজ লাভের বীজটি কি ভাবে বিস্তৃত হচ্চে, তার অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখি, এমন কোনো আয়োজনই হচ্চে না যা'তে বর্ত্তমান-কালের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিপুল ব্যবস্থার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমরা টিকে থাক্‌তে পারি। আমরা জোট বেঁধে কাজে হাত দিতে পারি নি। এখানে সেখানে দু'-দশটা তাঁত চালিয়ে এক বিরাট বস্ত্র-ব্যবসার ভিত্তিকে ভেঙ্গে দিতে পারব এমন কল্পনা করে' যদি আমরা স্বরাজ প্রাপ্তির প্রতীক্ষায় বসে' থাকি, তবে জান্‌ব আমাদের অদৃষ্টে আরো দুঃখ আছে। কুটিরজাত শিল্পের উন্নতি সাধন করে' দেশের অর্থশক্তি বৃদ্ধি না কর্‌লে আমরা প্রবলের সঙ্গে লড়বার শক্তি অর্জ্জন করতে পারব না, এ কথা কে অস্বীকার করবে? কিন্তু এই শিল্পের উন্নতি সাধনের পথ আবিষ্কারের জন্য কি প্রাচীন ভারতের ব্যবস্থা আজ বিংশতি শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগে প্রযোজ্য? আজ আমাদের ঘর ও বাহির সমস্ত পৃথিবীর ব্যবসা বাণিজ্যের সাম্‌নে উন্মুক্ত। যদি এর গতি রোধ করতে হয়, তবে তার আয়োজনও বর্ত্তমান কালোপযোগী হওয়া চাই।

কিন্তু খদ্দর চালনা যেমনভাবে হওয়া দরকার, তেমন করে' হচ্চে না,—আমি কেবল এই সমস্যার কথা উল্লেখ করে' খেদ করছি নে। আমার মনে হয় আমরা লক্ষ্যটাকে দেশের সাম্‌নে ধরতে পারছি নে। যতক্ষণ না লক্ষ্যটা সুস্পষ্ট হবে, যতক্ষণ না আমাদের চিত্ত সুপ্তির জড়তা থেকে মুক্তি পাবে, ততক্ষণ বাহিরের কোনো আয়োজনই সফল হতে পারে না।

জেলখানা থেকে বেরিয়ে এসে অনেক স্বদেশসেবক কর্ম্মক্ষেত্রের জন্য উন্মুখ হয়ে বসে আছেন। কি কাজে কোন প্রণালী অবলম্বন করে' তারা দেশসেবাব্রতে ব্রতী হ'তে পারেন এই হচ্চে এখন সমস্যা। উত্তেজনার মুখে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়ে তারা এখন যেখানে এসে ঠেকেছেন সেখানে আর থাকা চলে না। অতএব এইবার দেশের যুবকদের সাম্‌নে দেশকে গড়ে তোলবার মাল-মসলা এনে দিয়ে বল্‌তে হবে, "পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝে, বর্ত্তমানকালের সকল অবস্থার গতি কোন্ দিকে তার হিসাব মনে রেখে তোমরা দেশসেবার প্রকৃষ্ট পথ আবিষ্কার করে নাও।"

কিন্তু মুস্কিল এই, যে-দেশের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র আটঘাট বাঁধা নিয়ম-কানুনের ইঙ্গিতে চলে, সে-দেশে পথ আবিষ্কার করার প্রস্তাবটা হেঁয়ালির মতন মনে হয়। আমরা হয় গুরু, না হয় সংহিতা, না হয় শাস্ত্র—এমন

একটা কিছু অবলম্বন না করে' চল্‌তে পারি নে। এই অভ্যাস মজ্জাগত হ'য়ে উঠেছে বলে' মুখে স্বাধীনতার কথা যত জোরেই বলি না কেন, পথ চলার বেলা বলি "ওগো, কে আছ দেশনায়ক, আমাদের চালিয়ে নাও।"

যদি ভারতবর্ষ যথার্থ মুক্তি-প্রয়াসী হ'য়ে থাকে, তবে এই অভ্যাসের বন্ধন সর্ব্বপ্রথমে ছিন্ন করা প্রয়োজন। যে সমস্ত সামাজিক বিধিব্যবস্থা বাল্যকাল হ'তে আমাদের মনোবৃত্তির স্বাধীনতা প্রকাশের পথ সঙ্কীর্ণ করে দেয়, যে-শিক্ষা স্বাধীন চিন্তার উৎসকে বন্ধ করে' আমার চিত্তকে নানা ভাজে জড়িয়ে রাখে, সবার আগে তার বিস্তার ও আধিপত্য বন্ধ করতে হবে। এ-কথা বলা রাখা দরকার, ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক হিসাবে কোনো একটা জাতীয় জীবনের অস্তিত্ব আছে বা ছিল, কেবলমাত্র এই সত্যটুকু নিয়ে গৌরব করবার কিছু নেই। আজ পৃথিবীর কাছে ভারতবর্ষকে সম্মানের আসন পেতে হ'লে এই পরিচয়টাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন যে, জীবনী-শক্তির প্রকাশ রুদ্ধ হতে পারে এমন বহু জীর্ণ-সংস্কারের মূল আমরা উচ্ছেদ করেছি এবং আজ আমরা এমন কিছু গড়ব না, যে ব্যবস্থামধ্যে মানুষের চিত্ত স্বাধীন ভাবে বিকশিত হ'তে না পারে। এই জন্য আমি মনে করি আমাদের পরিবারের ও সমাজের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সেখানে যদি মানুষের চিত্তকে পঙ্গু করে করে দেওয়া হয় তবে রাষ্ট্রীয় স্বরাজ হাতে তুলে দিলেও আমরা স্বাধীন হ'তে পারব না।

অনেকের মুখে শুনতে পাই, দেশবাসীর মনে স্বাধীনতার জন্য যথার্থ স্পৃহা জেগেছে ; কেউ কেউ বলেন নিম্নস্তরেও নাকি এই উদ্দীপনা পৌঁছেছে। অস্বীকার করবার জো নেই ; কিন্তু দেশে যে স্বাজাত্যবোধের (National sense-এর) লক্ষণ দেখা দিয়েছে আমরা তার স্বরূপ যেন ভাল করে বুঝে লই। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ, পাঞ্জাবের নির্য্যাতন, খিলাফতের উচ্ছেদ প্রভৃতি অন্যায় অবিচার থেকে এই স্বাজাত্যবোধের জন্ম, একথা যদি সত্য হয়, তবে হয়ত কেবলমাত্র এই বোধের দ্বারা জাতির অন্তর্নিহিত শক্তি উদ্বুদ্ধ না হতেও পারে। অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করবার শক্তি আর স্বাজাত্য-বোধ এই দু'য়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে।

আসল কথা প্রতিবাদের উত্তেজনায় আমরা কাঠ-খড় পুড়িয়ে দেউলে হ'য়ে বস্‌লে পাকা ভিত গাঁথবার সুযোগ হারাব। শক্তির কেন্দ্র গড়ে না উঠ্‌লে কি করে মেনে নেব যে, এই অপমানিত লাঞ্ছিত দেশে যথার্থ স্বাজাত্যবোধ জেগেছে? দেশের অন্তরাত্মায় এই বোধ স্পর্শ করলে আমাদের ঘর, সমাজ, ধর্ম্ম, নীতি এমন প্রাণময় হ'য়ে উঠ্‌বে যে তখন জীবনীশক্তির স্বাভাবিক নিয়মে

আমরা মুক্তির সন্ধান পাবই। তারপর, স্বদেশ, স্বরাজ, যা' কিছু আমাদের নিজস্ব আমরা ফিরে পাব, সন্দেহ নাই।

অতএব বাঙ্গালা দেশে যারা দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করেছেন বা করতে ইচ্ছুক, তাদের কাছে নিবেদন করছি, গোড়া পত্তনের কাজে তারা মন দিন্। বাঁধিবুলি আওড়িয়ে বা রাজনৈতিক উত্তেজনার আবেগে শক্তির অপচয় করে কোন ফল নেই।

বর্ত্তমান আন্দোলন বদ্ধ-জীবনপ্রবাহে যদি একটু নাড়া দিয়ে থাকে, ক্রমে এ'তে গতি সঞ্চার করবার সময় এসেছে। তাই বাংলাদেশের তরুণ সম্প্রদায়কে আবার বড় এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে দেশের কাজে নাম্‌তে হবে। বিরুদ্ধ শক্তির প্রতিকূলতার মাঝখানে জাতীয়-জীবনের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে এগিয়ে চলার সাধনাই হচ্চে আমাদের একমাত্র কাজ। এই জন্য জাতীয় জীবনের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়া চাই ; যে-সকল বিধি-ব্যবস্থা এই জীবনের প্রকাশকে আচ্ছন্ন করে' রেখেছে, তা' জোর করে, ছিন্ন করা চাই ; তারপর, আমাদের সামাজিক আত্মার উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবন প্রাণ-শক্তির সন্ধান পাবে। তখন এই শক্তিই হবে স্বরাজের প্রাণ।

পল্লীসংস্কারের কাজে যারা হাত দেবেন, রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ না রেখে তারা কাজে প্রবৃত্ত হলে স্থায়ী ফল লাভ হতে' পারে, এই আমার বিশ্বাস। রাজশক্তির সঙ্গে কলহে উৎসাহ-স্ফুলিঙ্গ যে শিখায় পরিণত হয় না, বারম্বার আমরা তা' প্রত্যক্ষ করেছি।

যেখানে আমাদের জীবনীশক্তির মূল একেবারে অসার হ'য়ে আছে, সেখানে শক্তি সঞ্চার করতে হবে. এই হ'ল সকল চেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য। দেশের লোকের চিত্ত উদ্বুদ্ধ করা চাই ; তা' না হ'লে শক্তির সঞ্চার হবে কেমন ক'রে ? পল্লী-সমাজ যাদের নিয়ে গড়তে হবে তাদের চৈতন্যকে জাগিয়ে তোলাই হচ্চে প্রধান কাজ ; পল্লীকে সৌন্দর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে শ্রীমণ্ডিত যদি করতে চাই তবে এই কাজে মন দিতে হবে।

এ-কাজটা হচ্চে সৃজনের কাজ। সৃষ্টি হচ্চে postitive অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিকাশ এর ধর্ম্ম। এই জন্য সৃষ্টির কাজে সব জিনিষকে গ্রহণ করতে হয়।

কোনো প্রকার উত্তেজনা যদি মনকে অধিকার করে' বসে তবে সৃষ্টির কাজের ব্যাঘাত ঘটেই ; কেননা মানুষের চিত্ত তখন জীবনের গভীর কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে বাইরের কোন আশ্রয়কে অবলম্বন করতে চায়। এমন অবস্থায় কোনো সমস্যাই তলিয়ে দেখবার অন্তর্দৃষ্টি আর থাকে না। ভাসা

ভাসা যা' কিছু দেখতে পায় তারই উপর তখন নির্ভর; আশু ফল পাবার লোভে পথ ও পাথেয় খোঁজা তখন তার সব চেয়ে জরুরি কর্ত্তব্য হয়ে ওঠে। সে কল্পনা করে যে যদি কোনো বিশেষ একটা পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারে, যদি বাইরের কোনো ব্যবস্থা পাওয়া যায়, তা হলেই সমস্ত জাতির কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু কল্যাণ ত বাইরের জিনিষ নয়। অতএব কেবল মাত্র বাইরের আয়োজনে কল্যাণ নাই। চাই অন্তর্দৃষ্টি; চাই জাতীয়-জীবনে প্রবুদ্ধ চৈতন্য। আজ আমাদের এমন দুর্দ্দশা কেন,—তার প্রধান কারণ ইংরেজের শাসন ও বিদেশীয় বণিকদের অর্থ শোষণ নয়। আমরা সত্যকে হারিয়ে সমস্ত জাতিকে পথভ্রষ্ট করেছি—আর যে-দিন থেকে এ জাতি লক্ষ্যহারা হ'ল, তখনই ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, কাজের দোহাই দিয়ে অপকাজ, সমস্ত সমাজের স্তরে স্তরে এত আবর্জ্জনা স্তূপাকার করে' জমিয়ে গেল যে জাতীয় জীবন আজ তার পথ খুঁজে পাচ্চে না। আমাদের মন সংকীর্ণ, বুদ্ধি অসাড় ও শক্তি ক্ষীণ হয়ে উঠেছে কেন এ-বিষয়ে চিন্তা করবার সময় এসেছে। আজ আমরা শক্তির উৎস খুঁজ্‌তে গিয়ে হাত্‌ড়ে মর্‌ছি; আজ আমরা কাঙ্গাল,—পৃথিবীর অস্পৃশ্য জাতি! এ দৈন্য-দশা ঘট্‌ল কেন? আমাদের জাতীয় জীবনের অন্তরটা দুর্ব্বল, নির্জ্জীব ও আত্ম-অবিশ্বাসী হয়ে আছে ব'লে নয় কি?

বাইরের দৈন্য আমাদের অন্তরের দৈন্যকেই প্রকাশ করে। যে-পরিমাণে আমরা অন্তরের দারিদ্র্য ঘুচাতে পারব সেই পরিমাণেই আমাদের অভীষ্ট পথ মুক্ত হবে। যাকে আমরা সভ্যতা বলি তা' কোনো জাতির বিশেষ প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র—অতএব সেই প্রকাশ যদি কুশ্রী হয় তবে এ-কথা মান্‌তেই হবে যে, জাতীয়-জীবনের অন্দর-মহলে কোথাও নিশ্চয়ই শ্রী-হীন ব্যবস্থা রয়ে গেছে। শুনেছি জাপানীদের ঘর-দুয়ার খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; গ্রামগুলি দেখ্‌তে সুন্দর। আর রাস্তা-ঘাট ঘর-বাড়ীর পারিপাট্য আছে। এর কারণ সুধু এই নয় যে, জাপানীদের ঘরে টাকাকড়ি আছে। জাপানীরা স্বভাবতঃই সৌন্দর্য্যপ্রিয়। তাদের জীবনের অন্দর মহলে সৌন্দর্য্যের ভাব বর্ত্তমান আছে বলেই এদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনযাত্রার ব্যবস্থায় পরিপাট্যের ত্রুটি নেই। জার্ম্মাণির জাতীয় জীবনের সাধনা ছিল militarism—তাই তার সকল ব্যবস্থা এরই শাসনে নিয়ন্ত্রিত।

আজ আমরা স্বরাজ চাই। কার কাছ থেকে চাই? দেবার মালিক কে? যদি বলি স্বরাজ বাইরের একটা দান-সামগ্রী, আমরা সেই দান পাবার জন্যে হাত পেতেছি, তা'হলে আমার মতে সে স্বরাজে কোনো প্রয়োজন নেই।

স্বরাজ কেউ দিতেও পারে না, নিতেও পারে না। আমরা জাতীয়-জীবনে যে-সাধনা করব, জীর্ণ ভিতের উপর যে-আদর্শে পাকা গাঁথনি তুল্‌ব, তাই হবে আমাদের স্বরাজ।

আমাদের নিজেদের হাতে গড়ে তুল্‌তে হবে বলেই পল্লী-সংস্কারের কাজকে আমি সৃজনের কাজ বলে মনে করি। কোন্ আদর্শে গড়ব, তার উপলব্ধি হবে অন্তরে ও সেই উপলব্ধি রূপ ধরে বিকশিত হয়ে উঠবে আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে।

অতএব আমাদের চিন্তা ও ভাব কোনো উত্তেজনার দুরন্ত ঝঞ্ঝাবাতে যদি তার কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তবে সৃষ্টির কাজে ব্যাঘাত ঘটবে। এই জন্যই আমি বলেছিলাম যাঁরা পাকা ভিত্তি গাঁথ্‌বার কাজে মন দিতে চান্, যাঁদের কাজ কিছু গড়ে-তোলা, রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তেজনার সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগ না রাখাই কল্যাণকর। আয়র্ল্যাণ্ডের কথা বলতে গিয়ে কবি এই বলেছেন ঃ—

"Our excited controversies, our playing at militarism, have tended to bring men's thougthts from central depths to surfaces. Life is drawn to its frontiers away from its spiritual base, and behind the surface we have little to fall back on."

ভাবার্থ ঃ—"রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে তর্কবিতর্কের উত্তেজনা, সৈন্য-সামন্ত নিয়ে লড়বার এই আস্ফালন, এতে মানুষের চিত্তকে গভীর কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে বাইরের দিকে নিয়ে আসে। জীবন আধ্যাত্মিক মূল থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়লে বাইরের আশ্রয়ের উপর নির্ভর করা চলে না।

দ্বিতীয় কারণ হচ্চে, রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি এমন আকার ধারণ করে যে, তাতে কেবলই উত্তাপের সৃষ্টি হতে থাকে। কাগজে-কলমে বিধি-ব্যস্থায় যাই জাহির করি না কেন, দাবী-দাওয়া নিয়ে ক্রোধের উৎপত্তি হবেই ; আর, একবার ক্রোধের উত্তেজনা আমাদের মনকে অধিকার করলে আমরা একেবারে দৃষ্টিহারা হয়ে পড়ব। তখন জাতীয় জীবনের সমস্যার সত্য মূর্ত্তি চোখের আড়ালে পড়ে যাবে ; মনে হবে কোনো উপায়ে ক্ষুধিত, বস্ত্রহীন, স্বাস্থ্যহীন, শক্তিহীন, অশিক্ষিত দেশবাসীর ঘাড়ের উপর পড়ে' তাদের জাগাবার চেষ্টা করাই সব চেয়ে বড় কাজ।

কিন্তু মুক্তির সাধনা এমন করে' হয় না। সৃষ্টির কাজে ত মেকী মাল চলে না, সে মালের আধিভৌতিত গুণ থাক্‌লেও না। আমরা পল্লী-সংস্কারের কাজ হাতে নিয়ে কি দেখ্‌ছি ? নানা রোগে পল্লীর পনর আনাই রুগ্ন ; তাই

সংক্রামক ব্যাধি একবার লাগ্‌লে আর রক্ষা নাই। কত ভিটে উচ্ছন্ন গেছে ও যাচ্চে। বন-জঙ্গল, পানা-পুকুরে গ্রামের স্বাস্থ্য নষ্ট করছে, কিন্তু সে কথা জেনেও কোনো প্রতীকার করা যাচ্চে না। অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান নেই বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। কৃষকেরা ধান চাল কলাই যা' জন্মায় সহরের ব্যাপারী ও গ্রামের মহাজনের হাতে তা' তুলে দিতে হয় দেনার দায়ে। তারপর ঐ ধান-চালই কৃষককে মাড়োয়ারীর গোলা থেকে বেশী দাম দিয়ে কিনে খেতে হয়! এ-ছাড়া আরো কত উৎপাত উপদ্রব আছে তার সীমা নেই। পুরোহিত থেকে পুলিস সকলেই পল্লীবাসীর শত্রু, এ-কথা কি আপনারা অস্বীকার কর্‌তে পারেন?

তাই আমাদের প্রথম কাজ, আত্মস্থ হয়ে এই দুরূহ সমস্যার সত্য-মীমাংসার পথ আবিষ্কার করা। দেশের পনর আনা লোক যারা পল্লী-সমাজে বাস করে, তাদের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে, আর যে অনুপ্রেরণা নিয়ে জাতীয় জীবনের উদ্বোধন করা চাই, তাদের চিত্তে সে উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলতে হবে। এই হ'ল ভিত্তি। এখানে দৃষ্টি না দিলে পথ খুঁজতে খুঁজতেই আমরা পৃথিবী থেকে লোপ পাব। ক্রোধাবিষ্ট হ'লে আমরা সত্য-দৃষ্টি হারাব, এই জন্যই আমি মনে করি, পল্লী-সংস্কারের কাজে যারা ব্রতী হবেন, তাঁদের পলিটিক্যাল রেষারেষির সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা শ্রেয়।

তৃতীয় কারণ, রাজ-শক্তির সহিত সংঘর্ষণে এক দিকে কাজ ব্যর্থ হয়, আর এক দিকে অশিক্ষিত জনসাধারণের মনে ভীতির সঞ্চার হয়। সেবারে লর্ড কার্জ্জনের শাসনের ধাক্কা খেয়ে যখন আমাদের মন একটু সতেজ হয়ে উঠেছিল, তখনও আমরা গ্রামের দিকে ছুটেছিলুম। জীর্ণ পল্লীগুলীকে নতুন করে' গড়ব এ-উদ্দেশ্যটা খুব স্পষ্ট ছিল না—ছিল দেশের কথা সকলকে জানাব এই সঙ্কল্প। রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্তর্গত নানা সভা সমিতির তকমা পরে' আমরা এ-কাজে নেমেছিলুম। তার পর 'সি-আই-ডি'র উপদ্রব সুরু হ'ল; যারা নেতা হ'য়ে দেশকে উত্তেজিত করলেন, তাঁরা ত মিণ্টো-মর্লি রিফর্ম পেয়ে খুসী, আর সমস্ত দুঃখের ঝঞ্ঝাবাত বয়ে গেল তরুণ বাঙ্গালীর উপর দিয়ে। যারা তখন প্রাণ বিসর্জ্জন করলেন বা নির্ব্বাসিত হলেন, তাঁদের সেই দৃষ্টান্তে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নির্জীব প্রাণে কিছু জীবনী শক্তির সঞ্চার হ'ল বটে, কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা হ'তে বঞ্চিত দেশবাসী মনে করল, রাজার সঙ্গে লড়তে গিয়ে "ছেলে বাবুরা" হার মেনেছে। অতএব পুলিশের দারোগাবাবুকে সে আরো ভয় ক'রে চলে; তার পর 'ছেলে বাবু'দের পরিচালিত জাতীয়-বিদ্যালয়ের দরজা বন্ধ হ'তে বিলম্ব হ'ল না।

তাই আমার মনে হয়, এবার পল্লী-সংস্কারের কাজে যারা হাতে দিয়েছেন, তাঁরা-কোনো পলিটিক্যাল্ সভা-সমিতির তক্‌মা বুকে না পরে' খাঁটি জিনিস গড়ে তুল্‌বার দিকে মন দিন্। চরকা-প্রচলন করতে গিয়ে দেখেছি অনেকে চরকা ঘরে তুল্‌তে ভয় পায়। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, "চরকা হচ্ছে স্বরাজের প্রতিমূর্ত্তি।" আমি চরকার সঙ্গে অসহযোগীতা বা জালিয়ানওলাবাগের দুর্ঘটনা বা খিলাফত এমন কি স্বরাজেরও নাম জড়াতে চাই নে। যথেষ্ট সূতা দেশে তৈরি হয় না, অথচ এই গরীব দেশে অধিকাংশ গৃহস্থ যদি সূতা কাটে তবে অনেক সূতা পাওয়া যাবে। বড় বড় মিল চালাবার টাকা হয় ত আমাদের নেই; তা' ছাড়া যদি কুটীর জাত (cottage industry) স্থাপন করে' আমাদের প্রয়োজনটুকু মেটাতে পারি তাহ'লে যথার্থ কল্যাণ হয়। চরকার সূতা দিয়ে বোনা কাপড় একটু মোটা হবে—তা হোক, দেশের লোকের পক্ষে তাতে ক্ষতি নেই। তাই আমরা প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে চরকা চালাবার ব্যবস্থা করে' দেব; তাঁতিদের ডেকে তাঁত বসাব; বাইরে থেকে যা'তে কাপড় কিন্‌তে না হয় এমন আয়োজন করব। তারপর, তুলার চাষ হ'তে পারে এমন জমি নির্ব্বাচন ক'রে ভাল বীজ আনিয়ে দেব। প্রত্যেক পল্লী খাওয়া-পরার জন্য সম্পূর্ণভাবে আর কারো উপর নির্ভর করবে না, এই আদর্শ মনে রেখে আমরা পল্লীর আর্থিক উন্নতির চেষ্টা করব।

চতুর্থ কারণ, যারা রাজনৈতিক আন্দোলনের পথ-প্রদর্শক, তাঁরা পল্লী-সংস্কারের কাজে কোনো বিশেষ পথ নির্দ্দেশ ক'রে দিতে পারেন নি। স্কুল-কলেজ ছেড়ে ছেলের দল বেরিয়ে এসে যখন কাজ চাইল, কর্ত্তারা বল্‌লেন—"village organisation"—পল্লী-সমাজ পুনর্গঠন করতে হবে। উত্তম প্রস্তাব,—ছেলের দল রাজি হ'ল। তারপর কংগ্রেস-কমিটি থেকে পল্লী-সংস্কার করবার যে কার্য্য-সূচী পাওয়া গেল, তাতে চরকা চালাও, কংগ্রেসের সভ্য তালিকা ভুক্ত কর, তিলক স্বরাজ্য ফণ্ডে টাকা আন ইত্যাদি আদেশ (mandate) ছিল। যে আদর্শে গ্রামগুলীকে গড়ে তুল্‌তে হবে সে-সম্বন্ধে কারো মুখে কিছু শোনা গেল না। শোনা যাবেই বা কি করে? যারা রাজনৈতিক আন্দোলনের রথী, তাঁরা অনেকেই সহরের হাওয়ায় মানুষ। তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে দেশের যেটুকু স্থান ছিল, তা' হচ্ছে ইংরেজী পুঁথিতে, আর মামুলী রাজনৈতিক বৈঠকে। গ্রামবাসিদের সঙ্গে তাঁদের অনেকেরই ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই; তাই তাঁরা উৎসাহী কর্ম্মীদের পল্লী-সংস্কারের কাজে ব্রতী করতে পারলেন না।

তাই বল্‌ছিলুম যারা এ কাজে নেমেছেন তাঁদের প্রথম কাজ নিজেদের প্রস্তুত করা, আর দ্বিতীয় কাজ সমস্যার সত্য-মীমাংসার পথ আবিষ্কার করা। সেই জন্য চাই বুদ্ধির উদ্বোধন। বাঁধি-বুলি কপ্‌চিয়ে হৈ-চৈ ক'রে স্বদেশ প্রীতির আতিশয্যে আমাদের শক্তির অপব্যয় করলে দেশকে গড়ে-তোলা দূরে থাক, আমরা অনিষ্ট করব। এই অল্প দিনের মধ্যে বাঙ্গালী যুবকেরা উত্তেজনার তাপে অথবা উচ্ছ্বাসের আবেগে এমন সব কাজ করেছেন, যা' থেকে জাতীয় জীবনের ভাণ্ডে কিছু সঞ্চয় ত হয় নিই, বরং বর্ত্তমান আন্দোলনকে ছোট করা হয়েছে। স্কুল-কলেজ ছেড়ে দেশের কাজ করতে উপদেশ দিলেন গান্ধীজি। দলকে দল ছেলে বেরিয়ে এল—কিছু দিন তারা ফর্‌বস্‌ ম্যান্‌সনে অথবা দেশ-বন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাড়ীতে ভীড় করল। তারপর মিটিংএ স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করা ছাড়া আর তাদের অন্য কাজ ছিল না। পাড়াগাঁয়ে গিয়ে চাষাভূষোদের সকল অবস্থার তদন্ত করবার প্রস্তাব নিয়ে আমি অনেকের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম, তাঁরা প্রস্তাবটাতে আশু ফলের সম্ভাবনা না দেখে সে-কথা কানে তুললেন না। কিন্তু এঁদের মধ্যেই এক দল ছাত্র দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংএর সাম্‌নে শুয়ে পড়ে পরীক্ষার্থিদের যাবার পথ রোধ করে' মনে করলেন দেশের একটা কাজ হ'ল। তারপর বাঙ্গালা খবরের কাগজে যখন এঁদের প্রশংসা ছাপান হ'ল, তখন এঁদের উৎসাহ একেবারে ছাপিয়া উঠল। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীতে দাস-মনোবৃত্তি (slave mentality) জন্মায়, ছাত্রদের মুখে এই বুলি শোনা গেল।

আসল কথা বাঙ্গালী ভাব-প্রবণ বলেই তাকে এমন কোনো স্রোতে ভাসিয়ে দিলে চলবে না, যার টান সে সাম্‌লাতে পারে না। একটুখানি রসের আমেজ পেলেই হ'ল—সে তখন প্রশ্ন করে না, নির্ব্বিবাদে সব মেনে নিতে চায়। মেনে-নেওয়ার প্রবৃত্তির প্রাধান্য আছে ব'লে তার বুদ্ধি-বিচারের দিকটা পরিণতি লাভ করতে পারে নি। স্বায়ত্ত শাসনের শক্তি লাভ করতে পারব আজ সেই সাধনায় আমাদের প্রবৃত্ত হতে হবে।

আমি রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তেজনা থেকে দূরে থেকে পল্লী-সংস্কারের কাজে মন দেবার পক্ষপাতী বলে' কেউ মনে করবেন না, আমার মন স্বাধীনতালাভের আন্দোলনে সায় দিচ্চে না। আজ সমস্ত দেশ-জোড়া এই উদ্বোধন কার মনকে না উদ্বুদ্ধ করেছে? কিন্তু একে ব্যর্থ না করি শক্তির অপচয় ঘটিয়ে। স্বাধীনতার জন্য মানুষের যখন আকাঙ্ক্ষা জাগে, যখন অন্তরদেবতা ডাক দিয়ে বলেন "আমি মুক্ত, যতক্ষণ তুমি মুক্ত না হও ততক্ষণ আমার মুক্তি নেই," তখন মানুষের জীবনে যে পরিবর্ত্তন ও বিপ্লব

ঘটায়, আজ তার দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে, মনকে আশান্বিত করেছে। যাকে বলে national movement, অর্থাৎ জাতীয় জীবনের প্রকাশকে বাধামুক্ত করবার জন্য যে গতি, তার একটা নিজস্ব ধারা আছে। বাঙ্গালাদেশে সাহিত্যের রসাল কুঞ্জে তার প্রথম প্রকাশ—সেই আনন্দমঠের গানে "বন্দে মাতরম্;" তারপর নানা পথ দিয়ে নানা ভাবে এই মন্ত্রটি কাজ করেছে, আমাদের চিন্তায়, ভাবে, কর্ম্মে। আমাদের অলক্ষ্যে অগোচরে ঐ গানেরই সুর বেজেছে, তারপর যে-দিন ঘোরতর অপমানের ব্যথা বুকে বাজ্‌ল, তখন আমাদের কণ্ঠ দিয়ে প্রকাশ পেল সেই শক্তি যা' এত দিন গোপনে কাজ করছিল। আজ আবার এক সুযোগ এসেছে—এবার দেশের জনসাধারণের হৃদয় সাড়া পাওয়া গেছে; অতএব এবার আমাদের সংযত হ'য়ে, বুদ্ধি ও মনকে জাগ্রত রেখে কর্ম্মে ব্রতী হ'তে হবে। বাইরের উত্তেজনা আমাদের চিত্তকে স্থির হ'তে দেয় না;—যথার্থ অনুপ্রেরণার পথে বাধা ঘটায়।

পঞ্চম প্রস্তাব

পল্লীর হিতসাধন করবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যারা স্কুল-কলেজ ছেড়ে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা অনেকে বিফল-মনোরথ হ'য়ে ফিরে এসেছেন। যারা এখনও কর্ম্মক্ষেত্রে আছেন, তাঁদের কারো কারো মুখে নিরুৎসাহের কথাই শুনি। এঁরা সবাই বলেন, রাষ্ট্রীয় সাহায্য ভিন্ন এত কঠিন সমস্যার সমাধান হতেই পারে না—যেখানে তা' পাওয়া যাবে না, সেখানে অন্ততঃ জমিদার ও ধনীদের সাহায্য পাওয়া চাই; কিন্তু তাঁরা ত পল্লীসংস্কারের কাজে এখনও বড় ঘেঁষেন নি!

এদিকে জাতীয় মহাসভা রাজনৈতিক আন্দোলন ও হরতালের ব্যয় সঙ্কুলন করতে গিয়ে প্রায় সমস্ত কাঠ-খড় পুড়িয়ে পল্লীসংস্কারের কাজে কর্ম্মীদের হাতে কিছু দিতে পারলেন না। অর্থাভাব ও লোকাভাব এই দু'য়ের মাঝখানে পড়ে একদল স্বদেশ-সেবক পল্লীতে গিয়ে কেবল দুঃখই পেলেন, কোনো কাজের পত্তন করা হলো না!

যাই হোক্, এই অকৃতকার্য্যতাকে ক্ষতি ব'লে স্বীকার করা যায় না। এম্‌নি ক'রেই আমাদের দৃষ্টি সমস্যার আসল মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাবে; আমরা

বুঝ্‌তে পারব রুদ্ধ জীবনপ্রবাহে গতি সঞ্চার করার ব্রত সহজসাধ্য নয় দীর্ঘকালের আবর্জ্জনা পুঞ্জীকৃত হ'য়ে উঠেছে সমাজের স্তরে স্তরে, এখানে জীবনী-শক্তির প্রকাশ নেই, তাই যা-কিছু গড়তে যাওয়া যায়, বারম্বার ভেঙ্গে পড়ে।

কিন্তু যেখানেই বহু প্রাচীন সভ্যতার ভিৎ সেইখানেই জীর্ণতার লক্ষণ দেখা দেয়। নানা অভ্যাস সেখানে সংস্কার হয়ে দাঁড়ায়, আর কর্ম্মক্ষেত্র বহু সংস্কারের জালে জড়িয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে চীনদেশের কথা মনে পড়ছে; সেখানেও দেখছি প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের দ্বন্দ্ব চলেছে। জীর্ণ ভিতের উপর বর্ত্তমান কালের উপযোগী অনুষ্ঠান ও ব্যবস্থা গড়ে তোলা সে দেশেও দুরূহ হয়ে উঠল। তবু কেন ঠিক বল্‌তে পারি নে, চীনের রক্তমাংসে প্রাণ-শক্তির অভাব হয় নি। তাই এরা দেখতে দেখতে আবর্জ্জনা সরিয়ে দিতে পারল, সমাজকে পুনর্জীবিত করে তুল্‌লে, আর সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিপ্লব এনে দিলে। চীনের বর্ত্তমান ইতিহাসে আমাদের শেখবার অনেক বিষয় আছে, এই জন্য এইখানে চীনের নব-জাগরণের সম্বন্ধে কিছু বল্‌ব।

য়ুরোপের ছোয়া লাগ্‌তেই চীন মনে করেছিল ওদের মতন সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করে' পুষ্‌তে পারলেই চীন রক্ষা পাবে। কিন্তু এ উপায় খাট্‌ল না দেখে সে তার শাসন ব্যবস্থার ওলট পালট করবার মতলব করলে। যেমন করে হোক, একটা রিপাব্লিক্ দাঁড় করালে বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তার কোনো পাকা বন্দোবস্ত হয় নি। বিরাট কল-কারখানা স্থাপন করে' চীন দেখলে, এ'তে এক ভূত ছাড়াতে গিয়ে দেশটাকে আর এক ভূতে পেয়ে বসতে চায়। এম্‌নি করে' বাইরের উপকরণ সংগ্রহ দ্বারা চীন মাথা তুলে দাঁড়াতে গিয়ে বুঝতে পারলে তার মেরুদণ্ডটার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। যা'র অভাব হলে নতুন ভাবে নতুন ছাচে শাসনযন্ত্র ও সমাজকে ঢেলে গড়ে তোলা যায় না, অন্তরাত্মার সেই উদ্বোধন চীনের বাকী ছিল। অতএব চীনের নবীন সম্প্রদায় এই দিকে দৃষ্টি দিলেন; তাঁরা দেখলেন চীনের ভাষার পরিবর্ত্তন দরকার, দেখলেন বহু জীর্ণ সংস্কারের বাঁধন থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে না পারলে শিক্ষার সুবিস্তার হবে না; দেখ্‌লেন, সর্ব্বাঙ্গীন (universal) শিক্ষা প্রচলন না হ'লে দেশের লোককে নবযুগের বার্ত্তায় দীক্ষিত করা সম্ভবপর নয়।

আজ চীনের নব্য সম্প্রদায়ের এক দল এই দিকেই সম্পূর্ণ মন দিয়েছেন। ভাষা-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের ভিতর দিয়ে এঁরা বর্ত্তমান যুগে নানা চিন্তার স্রোত দেশের মধ্যে প্রবাহিত করে দিচ্ছেন। পশ্চিমের

সাহিত্য বিজ্ঞান ও দার্শনিক তত্ত্ব সমস্তই চীনভাষার সাহায্যে দেশের ভাবরাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করছে। এর ফলে চীনে যথার্থ স্বাধীনতার স্পৃহা জেগে উঠেছে ও সামাজিক নানা ব্যাধির প্রতিকারের জন্য বহু চেষ্টা দেখা দিয়েছে। নব্য সম্প্রদায়ের কথা বল্‌তে গিয়ে একজন অধ্যাপক বল্‌ছেন যে তরুণ চীনেদের এক দল মনে করেন, "China could not be changed without a social transformation based upon a transformation of ideas. The political revolution was a failure, because it was external, formal, touching the mechanism of social action, but not affecting conceptions of life, which really control society." ভাবার্থ—নব ভাব প্রণোদিত হ'য়ে প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থার যা' কিছু পরিবর্ত্তন ঘট্‌বে, তার সাহায্য ভিন্ন চীন তার জীর্ণ খোলস বদ্‌লাতে পার্‌বে না। রাজনৈতিক আন্দোলন ত ব্যর্থ হ'ল; কেননা তা'তে সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার বহিরঙ্গটায় কেবলমাত্র ধাক্কা লাগে; সমাজের কেন্দ্রে তা' পৌঁছয় না; যে-জীবনীশক্তি সমাজের সকল কর্ম্ম-চেষ্টার উৎস সেখানে নবচেতনার স্পন্দন না পৌঁছলে রাষ্ট্রীয় বিপ্লব সফল হ'তে পারে না।

চীনে এঁরা কোমর বেঁধে লেগেছেন জাতীয় জীবনের ভিৎ গড়ে তোল্‌বার জন্য; স্বাধীনতা লাভ করবার আগে এঁরা জাতির প্রাণকে জীবন্ত করে তুল্‌তে চেষ্টা করছেন! লেখক বল্‌ছেন—The teachers and writers who are guiding the movement lose no opportunity to teach that the regeneration of China must come by other means, that no fundamental political reform is now possible in China, and that when it comes, it will come as natural fruit of intellectual changes worked out in social, non-political ways."—ভাবার্থ—যাদের নেতৃত্বে চীনের এই সামাজিক আন্দোলন দেশে বিস্তার লাভ করছে, তাঁরা অবিশ্রাম এই কথাই প্রচার করেছেন যে, চীনের অভ্যুত্থান কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের দ্বারা সম্ভব হবে না; তা ছাড়া দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় শাসন-পদ্ধতির বিশেষ কোনো আমূল সংস্কার হতেই পারে না। চীনের নব-অভ্যুত্থান যখন আস্‌বে, আস্‌বে চিন্তাশক্তির বিকাশে দেশবাসীর নিগূঢ়তম অন্তরাত্মাকে জ্ঞান ও ভাব-সম্পদে উদ্বুদ্ধ ক'রে। এ-কাজ করতে হবে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ না রেখে।

আমি জানি আজকাল অনেকেই এই মতের সঙ্গে সায় দেবেন না। কিন্তু পল্লী-সংস্কারের কাজে হাত দিতে গিয়ে একে একে যে-সব দুরূহ সামাজিক

সমস্যা দেখা দেয়, তাতে মনে হয় চীনের এই নব্য সম্প্রদায়ের কর্ম্ম পদ্ধতিটাই শ্রেয়। আগে চাই মানুষ,—মানুষ না হ'লে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সংস্কার করে' কি হবে? স্বরাজের প্রথম ভিত্তি হচ্চে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায়, আর প্রথম ধাপ হচ্চে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধনে। তরুণ-চীনেরাও এই কথা বলেন, Democracy must be realised in education and in industry before it can be realised politically.

শিক্ষা সংস্কার করতে গিয়ে চীন দেখ্‌লে যে প্রচলিত ধর্ম্মমত ও অন্ধ-সংস্কার পথ রোধ করে' দাঁড়ায়। নব্য সম্প্রদায় বলেন, যেমন করেই হোক্ এ অচলায়তন ভাঙ্গতেই হবে।

"It has now to be worked in adaptation to new conditions even if it involves the overthrow of Confucian forms of belief and conduct."—অর্থাৎ কন্‌ফুসিয়ান্ বিশ্বাস ও রীতিনীতি যদি নির্ম্মূল করাও প্রয়োজন হয়, তবু তাই করতে হবে, চীনকে বর্ত্তমান কালের সঙ্গে যোগ রাখ্‌বার জন্যে।"

আজকাল শুনতে পাওয়া যায় 'স্বরাজ' সাধনার অর্থ হচ্চে প্রাচীনের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে বর্ত্তমান কালের সর্ব্বপ্রকার উৎপাত উপদ্রব থেকে নিজেদের আত্মরক্ষা করা। সনাতন আচার-বিচার, কর্ম্মপদ্ধতি, জীবনযাত্রার ধারা এই সমস্তই নাকি আমাদের আত্মরক্ষার পথ।

কিন্তু পুরাতন খোলসের মাঝে আশ্রয় নিয়ে আমাদের মুক্তি ত মিল্‌বেই না, বরং পথ আরো তমসাচ্ছন্ন হ'য়ে উঠবে। এই সহজ হিসাবটা মনে রাখা দরকার যে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগ স্থাপন হয়েছে; সমস্ত পৃথিবীর চলার সঙ্গে আমাদের পা ফেলে চলতে হবে। মধ্যযুগের ব্যবস্থা যতই ভালো হউক, বর্ত্তমান যুগে তা' অনেকটা বাতিল হ'য়ে গেছে—যদি তার কিছু ব্যবহারে লাগে তাও ঘষে-মেজে সংস্কার করে তবে কাজে লাগতে হবে।

যাঁরা পল্লীসংস্কার করতে গিয়েছিলেন তাঁরা সমাজের ঘরে বাইরে সঞ্চিত আবর্জ্জনা সরিয়ে ফেলবার শক্তি ও ধৈর্য্য অর্জ্জন করেন নি, তাই তাদের ফিরে আস্‌তে হ'ল। গ্রামে কি দেখ্‌তে পাই? যেন সকল কাজকর্ম্ম চল্‌চে ঘুমপাড়াবার মন্ত্রে। বাঁধা নিয়ম, শাস্ত্রের শাসন, আচার বিচারের কঠোর অনুশাসন, এই-সব গ্রামবাসীর ভাল লাগে—এ'র আশ্রয়ে তারা নিজেদের নিরাপদ মনে ক'রে খুসি থাকে।

যিনি পল্লীসংস্কারের কাজে ব্রতী হবেন, তাঁকে এই বাঁধ, এই খোলস ভাঙ্গতে হবে। কাজ কঠিন, কিন্তু যদি এ অসম্ভব হয়, তবে স্বরাজও অসম্ভব।

আপনারা জিজ্ঞসা করবেন, কি-উপায়ে এই সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া যেতে পারে। প্রথমেই মনে রাখা দরকার, যারা কর্ম্মী তাদের জানা চাই কোনো জোড়া-তালির ব্যবস্থা দ্বারা সমস্যার সমাধা হবে না। কর্ম্মীদের মধ্যে সেই শক্তি চাই, যার উপর ভর করে' এরা দুঃখের ও অপমানের মধ্যে ঝাঁপ দিতে পারে।

নিজেদের শিক্ষা ও দীক্ষা এই কাজের অনুযায়ী হলে তারপর প্রথম কাজ হবে, গ্রামের তরুণ সম্প্রদায়কে হাত করা। তাদের দিয়ে গ্রামের চলাফেরার রাস্তার সুব্যবস্থা করা সর্ব্বাপেক্ষা দরকার। এ-কাজে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্য পাওয়া হয়ত অসম্ভব হবে না। রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা হ'লে তারপর একটি কেন্দ্রস্থাপন করা—যাকে বলা যেতে পারে community centre. কেন্দ্রটি নির্ব্বাচনের সময় দেখা দরকার, পল্লীর সকলের পক্ষে এখানে যাতায়াত করবার সুবিধা আছে কিনা। এমন একটি কেন্দ্র স্থাপিত হ'লে বিদ্যালয়, ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা, কৃষি ও কুটিরজাত শিল্পের উন্নতি-সাধনের উপায় উদ্ভাবন, একে একে এই-সব আয়োজন করা দরকার হবে। কোন্ আদর্শে এই কেন্দ্র (community centre) গড়া প্রয়োজন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাগুলির পত্তন কিভাবে করতে হবে, এ-কাজে একদল কর্ম্মী মনোনিবেশ না করলে জাতীয় জীবনের ভিত্তি গড়ে উঠ্‌বেনা। ভিত্তি গড়া সহজ নয়—যতই দিন যায় তার সমস্যা আরো জটিল হ'য়ে উঠ্‌ছে। অথচ ভিত্তিটা ঠিক্ না হ'লে আমরা বারম্বার কর্ম্মক্ষেত্রে নিস্ফল হতে থাক্‌ব। জাতীয় জীবনের ভিত্তি পল্লীসমাজ; তাকে আশ্রয় করেই রাষ্ট্র গড়ে উঠ্‌বে। তাই সেই ভিত্তির পুনর্গঠনের পথ ও পাথেয় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব।

ষষ্ঠ প্রস্তাব

ভারত শাসন সংস্কার করবার প্রস্তাব করে' মণ্টেগু সাহেব যে-সুপাঠ্য রিপোর্টখানি লিখেছেন, তা'র ১৩৬ দফায় বলা হয়েছে :—

The Fraction of the people who are town dwellers contribute only a very small fraction to the revenues of the State. On the other hand, is an enormous country population immersed indeed in the struggle for existence. The rural classes have the greatest stake in the country, because they cortribute most to its revenues. Among them are a few landlords and a large number of yeoman farmers

ভাবার্থ—রাজকোষে সহরবাসীরা অতি সামান্য রাজস্ব দেয়। পল্লীবাসীরা—যারা জীবনসংগ্রামে হাবুডুবু খাচ্চে—তাদের কাছ থেকেই রাজ ভাণ্ডারে অধিক ধনাগম হয়; অতএব এদের দাবীই সব চেয়ে বেশী। পল্লীতে জমিদার ও ভদ্র গৃহস্থ অনেকেই এখন বাস করে।"

আমাদের শাসনকর্ত্তারা জানেন দেশের পনর আনা লোক পল্লীতে বাস করে; এরাই দেশের অন্নদাতা, রাজস্ব-ভাণ্ডারে এদের দেয় অর্থের পরিমাণ সব চেয়ে বেশী। বাংলাদেশে বড় বড় সহর মাত্র দুটো; ছোট ছোট সহর ১১৭; কিন্তু পল্লীর সংখ্যা ১,১৯,৭৩২; সহরে প্রায় ৩০ লক্ষ লোকের বাস; আর পল্লীগ্রামে লোকসংখ্যা সাড়ে চার কোটি হবে। সহরের ঐ ৩০ লক্ষের মধ্যে ১৫ লক্ষ অস্থায়ীরূপে সহরে থাকে। অতএব, ঠিক সহুরে বল্‌তে যা বোঝায়, তার সংখ্যা ১৫ লক্ষের বেশী নয়!

এই বিপুল জনসংখ্যার অবস্থার তদন্ত করলে বুঝতে পারি আমাদের দুর্গতির বোঝাও একটা নয়;—অন্নসমস্যা, বস্ত্রসমস্যা, শিক্ষাসমস্যা, স্বাস্থ্য-সমস্যা এগুলির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সমস্যা এমন জটিলাকার ধারণ করে দেখা

দিয়েছে যে এই গোলক ধাঁধায় পড়ে ঠাহর করা দায় কোন্ পথ ধরলে আমরা নিষ্কৃতি পাব ; কিন্তু সহজে এই জটিল-সমস্যার সমাধান হবে না।

রাজনীতিবিশারদেরা একদল ভাবছেন "শাসন যন্ত্রটা একবার আমাদের করতলগত হ'লে তারপর দেশকে গড়তে বিলম্ব হবে না। আমরা প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার করব ; পল্লীতে পল্লীতে হিতকর নানা অনুষ্ঠানের পত্তন করব ; কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধন করব ; দেখ্‌তে দেখ্‌তে আলাউদ্দীনের প্রদীপের সাহায্যে দেশ জীর্ণ খোলস থেকে বেরিয়ে আস্‌বে।" তারপর আংশিক পরিমাণে শাসনযন্ত্রের কোনো কোনো বিভাগের কর্ত্তৃত্বভার আমাদের উপর ন্যস্ত করা হ'ল ; পল্লীবাসীদের হাতে ভোট দেবার অধিকার দিয়ে (একে বলে Ballot-box democracy) তাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের সমারোহে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আসনে বসান হ'ল ; কিন্তু হ'ল না পল্লীর ব্যবস্থায় কোনো বিশেষ পরিবর্ত্তন।

'Rural constituency' থেকে যারা এসেছেন, তাদের মুখেও পল্লী ব্যবস্থার সংস্কার ও সংশোধন করবার প্রস্তাব শোনা যায় নি। যখন কোনো প্রস্তাব এসেছে, তার ভালমন্দ বিচার করা হয় জমিদার বা ব্যবসায়ীদের সুবিধা অসুবিধার মাপকাঠিতে।

এই জন্য আমার মনে হয়, ভোট দেবার অধিকারটুকু হাতে পেলেই কাজ শেষ হ'ল না। এই উপায়ে গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্র-জীবনের পত্তন হয় না। রাষ্ট্র-হিতসাধনের জন্য আজ যে সব সংস্কার করা হয়েছে, দেখ্‌ছি তাতে ব্যয় ভার বৃদ্ধি হয়েছে ; এই ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য নূতন ট্যাক্স বসেছে। তাতেও যখন কুলোল না, তখন খরচের মাত্রা কমাবার চেষ্টা হচ্চে। প্রস্তাব হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার তহবিলটা অনেকটা কেটে ছেঁটে ফেলা যাক অথবা নতুন কর বসানো হোক। কৃষি উন্নতির ব্যবস্থাটাও এত বিস্তৃত না হ'লে চলে ; স্বাস্থ্য-বিভাগের ব্যয়ও কমান চলে। অথচ, এই সব কর্ম্ম বিভাগের বিস্তার ভিন্ন পল্লীর হিতসাধন সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে উপায় কি ?

লর্ড রিপনের আমল থেকে আমরা স্থানিক স্বায়ত্বশাসনের (Local Self-government) দায়িত্বভার পেয়েছিলাম ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত পল্লী-সংস্কারের জন্য আমরা বিশেষ কিছু করতে পারি নি। মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, পঞ্চায়েৎ সভা, কোনোটাই ভাল চল্‌ছে না। চৌকিদারী পঞ্চায়েতের হাত থেকে দায়িত্ব তুলে নিয়ে ইউনিয়ন্-বোর্ডের সৃষ্টি হ'ল ; এই বোর্ড শালিসি আদালত বসাতে ও ট্যাক্স পর্য্যন্ত আদায় করতে পারবে। উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু সমিতির কর্ণধারেরা কি করছেন? সংখ্যা হিসাবে

কয়েক হাজার গ্রাম্য সমিতি স্থাপিত হয়েছে বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত :তারা পল্লীর হিত সাধনের জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন? লর্ড লিটন একবার আক্ষেপ করেছিলেন চৌকীদারী ট্যাক্স, রোডসেস্ প্রভৃতি টাকা স্বায়ত্ব শাসনের জিম্মায় দিয়েও পল্লীর পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি কিছু হয় নি। কিন্তু কেন হয় নি?

স্বায়ত্ব শাসনের প্রতিষ্ঠানগুলি যদি প্রকৃত কল্যাণ সাধন না করে' থাকে, তবে সে-জন্য শাসন কর্ত্তাদের সম্পূর্ণ দোষী করা চলে না। প্রথমতঃ আমাদের যোগ্যতার অভাব। জার্ম্মানিতে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনর হ'তে গেলে School of Municipal Administration থেকে পাস্ কর্‌তে হয়; দেশের প্রকৃত অবস্থা তাদের জানা থাকে। আমাদের দেশে য'ার দু' পয়সা আছে অথবা যারা ধনীর দুয়ারে যাতায়াত করে, তারাই এ কাজের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

আমাদের অনেক মিউনিসিপ্যালিটিতে করদাতাদের সঙ্গে কমিশনরদের বনিবনাও নেই; পঞ্চায়তকে পল্লীর সাধারণ লোক বন্ধু বলে মনে করে না; সরকারী চাপরাশ নিয়ে যারা পল্লীতে যাতায়াত করেন, পল্লীবাসীরা তাদের সন্দেহের চোখে দেখে।

এমন হওয়ার কারণ এই যে, পল্লী-প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাগুলর সঙ্গে পল্লী জীবনের জৈব সম্বন্ধ (organic relation) নেই। অথচ এই সম্বন্ধ না হ'লে কোনো ফলই আশা করা যেতে পারে না। শাসন সংস্কারের দ্বারা কাঠামোটা নিখুঁত করা গেলেও প্রাণশক্তির উৎস্ আস্‌বে কোথা থেকে।

ঐতিহাসিক সত্য এই যে, দেশের অন্তস্থলে যে উৎস আমাদের পল্লী জীবনকে সরস রাখত, বিদেশীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা তার স্রোতপথ বন্ধ করে দিয়েছে। দেশজাত প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে এখন বোর্ডের পর বোর্ড, কমিটীর পর কমিটি স্থাপিত হচ্চে, কিন্তু পল্লীসমস্যার সমাধান হচ্চে না।

কেমন করে' কোন ঘটনা পরম্পরায় আমাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি ভেঙেচুরে গেছে, তার ঐতিহাসিক বিবরণ এখানে নিষ্প্রয়োজন। একে একে কৃষিজীবী, শিল্পী, কারিগর কোন্ চক্রের বুহ্যের মধ্যে কেমন করে আবদ্ধ হ'য়ে পড়ল, সে বৃত্তান্তের আলোচনা করেও কোনো ফল নেই। এক দিন গ্রামের শালিসী বিচারের ব্যবস্থা গ্রামেই ছিল; তার ফলে পরম কল্যাণ সাধিত হত। শালিসী বিচারে আসামীর জরিমানা আদায় করে তার সাহায্যে মন্দির মেরামত, পুষ্করিণী খনন, অতিথি-সেবা ইত্যাদি গোষ্ঠীজীবনের অনেক কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সপন্ন হ'ত। আজ সে-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে আদালতের সৃষ্টি হয়েছে।

—শুনতে পাই, দেশের লোক বছরে মামলাবাজিতে ২১ কোটি টাকা ব্যয় করে। আদালতের আশ্রয়ে হাজার হাজার লোক প্রতিপালিত হচ্চে ; হাজার হাজার টাকা তাদের ঘরে জমছে। আজ যদি শালিসী-বিচারের কথা ওঠে, তবে এই উকিল মোক্তার ব্যারিষ্টার ও বিচারকদের দল সে কথায় সায় দেবে কেন ?

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনেল্ড এক দিন লিখেছিলেন,—We have destroyed in Indian social life all those courts of arbitration, and all those offices which had, as one of their functions, the settlement of personal disputes. We have thus driven the people to the Pleader and the Barrister and the Law Court.* অর্থাৎ আমরা শালিসী আদালতের ভিৎ ভেঙ্গে আজ দেশের লোককে উকিল, ব্যারিষ্টার ও আদালতের দ্বারস্থ হ'তে বাধ্য করেছি।

তারপর, সঙ্গতি লাভের জন্য পল্লীর কৃষিজীবী, শিল্পী ও কারিগর বেঁচা-কেনা ও ধনোৎপাদনের সুযোগ সুবিধার জন্য যে সব ব্যবস্থা করেছিল, তা' ভেঙ্গে গিয়ে মহাজন, মুদি, ব্যাপারী দালাল স্থান দখল ক'রে বসেছে। সহরের বড় কোম্পানীর আওতায় এরা কাজ করে ; এদের মধ্যে মাল বেচা-কেনা নিয়ে রেষারেষির অন্ত নেই। মাঝখান থেকে যাদের সম্বল অল্প সেই নির্ধনের দল দারিদ্র্যের হাতে নিজেদের আমরণ সমর্পণ করে। ধনীর একচেটিয়া রোজগারের হাটে, আর-কোনো ব্যবস্থা স্থাপন করবার প্রস্তাব হ'লে, তার কাছ থেকে সায় পাওয়া দায়। সমবায় সমিতি গঠন করে' পাট বেচার ব্যবস্থা এই জন্যই স্থায়ী হতে পারল না।

তাই মনে হয়, রাষ্ট্রীয় শাসন সংস্কার যাই হোক্ না কেন, এ দ্বারা যদি কিছু উপকার পাওয়া যায়, তা' মুষ্টিমেয় অভিজাতের সৌভাগ্যেই লাভ হবে। যারা শ্রমী, যাদের শ্রমলব্ধ অর্থে রাজস্ব ভাণ্ডার পূর্ণ হয় তাদের অদৃষ্টে থাক্‌বে ধনীর উচ্ছিষ্টমাত্র ; এমত অবস্থায় গণতন্ত্রের ভিত স্থাপন করা অসম্ভব।

এই কারণে গান্ধিজী বলছেন তিনি চান poor man's democracy অর্থাৎ নির্ধনের রাষ্ট্রতন্ত্র স্থাপন করে তিনি দেশের রাষ্ট্রেও সমাজে 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা'র আদর্শ অক্ষুন্ন রাখবেন! অথচ তার ইঙ্গিতে যে জাতীয় প্রতিষ্ঠান ওঠে বসে, সেখানে এ-দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অধিকার নিয়ে কথা ওঠে, কিন্তু কৃষিজীবিদের অধিকার সম্বন্ধে কংগ্রেস-বক্তৃতা-মঞ্চে বিশেষ

*Mr. Ramsay Macdonald—The Awakening of India.

কিছু শোনা যায় না। যখন শোনা যায়, তার প্রধান কারণ—কৃষি-জীবির অধিকারের অসাম্য ব্যবস্থার প্রতীকার করা নয়, এই আন্দোলনের সূত্রটি নিয়ে কংগ্রেসের দাবী জাহির করা। আজ পূর্ণ স্বরাজের দাবী করছি, কিন্তু যে দেশে সমাজের ও ব্যবহারিক জীবনের ভিত্তির প্রধান অবলম্বন কৃষি, সেখানে জমির স্বত্বাধিকার নিয়ে যে-সব অসঙ্গত ব্যবস্থা আছে তার প্রতিবিধান করার কথা মনে পড়ছে না। অথচ এই জমিজমার অধিকার নিয়ে পল্লীসমাজে বহু অনর্থের সৃষ্টি হয়েছে ও হচ্চে। বাংলাদেশে লর্ড কর্ণওয়ালিশ কৃষকের অধিকার এক রকম উপেক্ষা করে' একদল ইজারাদারের সৃষ্টি করলেন। এই ব্যবস্থায় পল্লীসমাজে ঘোর অসাম্য দেখা দিল; ইজারাদারের অধিকার আবার টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভাগবিলি হ'তে লাগল। এমনি করে জমির সম্পূর্ণ অধিকার ইংরেজ-শাসনের আমলে যাদের হাতে গিয়ে পড়ল, তাদের সঙ্গে জমির আবাদ করা বা কৃষির উন্নতি করা এসব কাজের কোনো সম্বন্ধ রইল না। যাদের জোৎ স্বত্ব নেই, তারাই বাংলাদেশের অধিকাংশ চাষী ও ভাগচাষী। পূর্ণ স্বরাজের প্রশস্ত আঙিনায় যদি এদেরও আহ্বান করতে হয়, তবে জমিজমার ব্যবস্থা নিয়ে যে-সব অনৈক্য আছে তার সমাধান করতে হবে। নতুবা স্বরাজের আশীষ অপূর্ণ থেকে যাবে।

অতএব poor man's democracyর আদর্শটা নিয়ে আমাদের ভাব্‌তে হবে; কেননা এই আদর্শের পরিণতির জন্য গোলটেবিলের দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করলে আমাদের রাষ্ট্রজীবনে আরো গোল বাঁধবে। মুস্কিল এই রাষ্ট্র গঠনের কোনো নক্সা আঁকতে বসলেই আমরা পাশ্চাত্য দেশীয় ষ্টেটের অনুকরণ করতে চাই। তাই কংগ্রেস নেহরু রিপোর্টে রাষ্ট্র-সংস্কারের যে-সকল প্রস্তাব দাখিল করেছে—তার মধ্যে কোনো বিশিষ্টতা নেই। অথচ আমাদের দেশে রাষ্ট্র-জীবনের আশ্রয় ছিল সমাজ; সমাজের কেন্দ্রে যে-শক্তি কাজ করেছে, যার প্রভাবে নানা অনুষ্ঠানে গ্রাম্য সভ্যতার ক্ষেত্রকে ব্যাপক করে' তুলেছে, আমরা তার প্রতি উদাসীন হ'য়ে এ-দেশের উপযোগী রাষ্ট্র গড়তে পড়তে পারব না। এই জন্যই আমি পঞ্চায়েত শাসনের পক্ষপাতী; আমি মনে করি এই শাসন-ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার হ'লে বিলাতি ধাঁচের ডিমোক্রাসী আমদানী করার প্রয়োজন হবে না। পঞ্চগ্রাম, দশগ্রাম, শতগ্রাম প্রভৃতি নামকরণ থেকে মনে হয়, ছোট ছোট পল্লীগুলি নিয়ে এক একটি কেন্দ্র সৃষ্টি হয়েছিল শাসনকার্য্যের জন্য।

পল্লী সমাজের পুনর্গঠনের কাছে ও আমি মনে করি দু'-পাঁচটা গ্রাম নিয়ে এক একটি কেন্দ্র গঠিত করে' তার সাহায্যে পল্লীতে পল্লীতে বর্ত্তমান

কালোপযোগী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা আবশ্যক। এই কেন্দ্রগুলি কর্ম্মীদের স্বদেশসেবার উৎসাহে ও উদ্দীপনায় জীবন্ত হ'য়ে উঠ্‌বে; যে-সকল উপকরণের সাহায্যে পল্লী-সমাজ নবপ্রাণে সজীব হয়ে উঠ্‌বে তা'ও সংগৃহীত হবে এই কর্ম্মকেন্দ্রে। কৃষিজীবি, শিল্পী, কারিগর এদের জীবন যাত্রায় অসাম্য ব্যবস্থার প্রতিবন্ধক দূরীভূত হ'লে প্রাণ সঞ্চারিত হবেই। তখন আত্মকর্ত্তৃত্বের শক্তি আপনা হ'তেই আমাদের দুরূহ সমস্যার সমাধান করবে; তখন আমরা যে "স্বরাজ" লাভ করব, তা' পরদত্ত কোনো রাষ্ট্রীয়-যন্ত্রের দেওয়া স্বরাজ হবে না; তা' আমাদের নিজস্ব সম্পদ হবে।"

কিন্তু "পল্লীসংস্কার-কেন্দ্র" স্থাপনের জন্য কর্ম্মীদের অভাব আছে, অনেকের মুখে এই অভিযোগ শুন্‌তে পাই। যারা এ-কাজে হাত দিয়েছেন, তারা "স্বেচ্ছাসেবকের" দল। দীর্ঘকাল কোনো একটা কাজে নিজেদের নিয়োগ করবার ইচ্ছা থাক্‌লেও অর্থাভাবে তারা সে সংকল্প সার্থক করতে পারেন না। এই জন্য আমার মনে হয়, বাংলাদেশের এক দল শিক্ষিত যুবক পল্লীর কাজটাকেই একটা 'Career' অর্থাৎ সঙ্গতি লাভের পন্থা বলে এই কাজে মনোনিয়োগ করলে দেশের পরমহিতসাধন করা হয়। তারা অগ্রণী হ'য়ে পথ না দেখালে আমরা পল্লী-সংস্কারের কাজে কখনই সফলতা লাভ করব না। কবি রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশের যুবককের আহ্বান ক'রে বলেছিলেন ঃ—

"তোমরা যে পার এবং যেখানে পার এক একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ কর। শিক্ষা দাও, কৃষিশিল্প ও গ্রামের ব্যবহার সামগ্রী সম্বন্ধে নূতন চেষ্টা প্রবর্ত্তিত কর; গ্রামবাসিদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার কর, এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ বিধি উদ্ভাবিত কর। এ কর্ম্মে খ্যাতির আশা করিয়ো না; এমন কি, গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে বাধা ও অবিশ্বাস স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে কোনো উত্তেজনা নাই, কোনো বিরোধ নাই, কোনো ঘোষণা নাই, কেবল ধৈর্য্য এবং প্রেম এবং নিভৃতে তপস্যা—মনের মধ্যে কেবল এই একটিমাত্র পণ যে, "দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে যাহারা দুঃখী তাহাদের দুঃখের ভাগ লইয়া সেই দুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিব।"

এক দল কর্ম্মী কোনো এক কেন্দ্র স্থাপন করলে তারপর কি ভাবে কোন্ প্রণালী অবলম্বন করে' কাজ করা যাবে, এই প্রশ্ন উঠবে। ইতিপূর্ব্বে

প্রসঙ্গক্রমে কোনো কোনো স্থানে এই বিষয় আলোচনা করেছি। মোটকথা যেখানে কাজের পত্তন করা হবে, সেখানকার সকল অবস্থা বিচার করা একান্ত দরকার। ভাল হৌক মন্দ হৌক যে যে ব্যবস্থা পল্লীসমাজে বিদ্যমান, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে' নূতন ব্যবস্থার ভিত তুল্‌তে হবে। অধ্যাপক হেত্রজ বলেন, "A true policy will recognise the inseparable inter-relations existing between the social and economic activities of farm life and not divorce them. It will seek to correlate all agencies so that the development of these activities will advance in proper degree and in proper relation to one another. Any other ideal must surely result in dwarfed and retarded development. The economic and social are inseparably bound up in the farmers' life ; in his thoughts and plans and activities he never clearly separates the one from the other. This trait of rural psychology must be kept always in mind in the formulation and execution of any policy." ভাবার্থ—কৃষিজীবির সামাজিক জীবনের সঙ্গে তার সঙ্গতিলাভের কর্ম্মচেষ্টার অভিন্ন সম্বন্ধ আছে। এই কারণে সকল ব্যবস্থায় তার মনস্তত্বের প্রকৃতি মনে রেখে পল্লীসংস্কারের "পথ ও পাথেয়" নির্দ্দেশ করা সঙ্গত।

আমাদের নিজস্ব ব্যবস্থাগুলি যা' এখনও গোষ্ঠীজীবনের ভিত্তি স্বরূপ, তার সঙ্গে পল্লীসংস্কার কেন্দ্রের যোগ স্থাপন করা অসম্ভব নয় ; কিন্তু মুস্কিল এই, স্থানিক স্বায়ত্ব শাসনের দোহাই দিয়ে যত গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন। বোর্ড, ইউনিয়ন, থানা, পোষ্টাফিস, সমবায় সমিতি ইত্যাদি যাবতীয় ব্যবস্থার সঙ্গে পল্লীকেন্দ্রের ঐক্য স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আজই যদি ঐক্য সাধনের সম্ভাবনা না থাকে, তবু নিরাশ হ'বার কারণ নেই ; পল্লীকেন্দ্র যাবতীয় মঙ্গল কর্ম্ম পরিচালনার দায়িত্বভার হাতে নিয়ে কাজ সুরু করলে এক দিন সরকারী ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘট্‌বেই।

এইখানে জাপানের দৃষ্টান্ত মনে পড়ল। জাপানে প্রতি গ্রামে একটি সমিতি (Youngmen's Association) আছে ; পল্লীর যাবতীয় কাজে এরা সহায়তা করে। এদের উদ্দেশ্য—মণ্ডলীর মধ্যে ঐক্যসূত্র স্থাপন করা (the object is to develop the spirit of the community)। কিছুদিন পূর্ব্বে এই গ্রাম্য-সমিতির বিবরণ পড়ছিলুম ; মনে হচ্ছিল,

এই প্রণালী অবলম্বন করে, আমাদের দেশে কতকগুল কেন্দ্র গঠিত হ'লে পল্লী-সংস্কারের কাজ যথার্থ আরম্ভ হ'তে পারে।

জাপানী যুবক-সমিতি পল্লীর ছেলেদের ব্যায়াম শেখায়; সমিতির হুকুম তারা অমান্য করে না। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় এদের নেতৃত্বে চলে; কৃষি উন্নতির জন্য এরা সরকারী বিভাগের সঙ্গে একত্রে কাজ করে; মঠের দেবোত্তর সম্পত্তির চাষবাস এরা করে; গ্রামে আগুণ নিভাবার ব্যবস্থা এদের হাতে। রেশমব্যবসার বিস্তারে যুবক সমিতির সভ্যেরা বিশেষ সহায়তা করে; তারপর, যদি কোথাও জলসেচন বা জলনিকাশের মতন কোনো বৃহৎ কাজের তাগিদ আসে, তখন জোট বেঁধে সমিতি গঠন করার দায়িত্ব এরাই গ্রহণ করে। কয়েক বছর পূর্ব্বে অনাবাদী একটা বিস্তৃত মাঠ, যেখানে কখনও ধানের চাষ হ'ত না, সেখানে জল সেচনের ব্যবস্থা করে জমিটা চাষোপযোগী করা হয়েছে। এই জল সেচন সমিতির সভ্য সংখ্যা ৫৫০; এরা ব্যাঙ্ক থেকে ৪০,০০০ ইয়েন ১৫ বছরের মধ্যে শোধ করবে এই করারে ধার নিয়েছিল।

গাছপালা রোপণ করা দরকার—অতএব জাপানের সব যুবক সমিতি গত বছর ৩০০,০০০ চারা গাছ রোপণ করেছে। যেখানে বছর বছর বন্যা আসে, সেখানে বাঁধ দেবার ব্যবস্থা করেছে; কৃষি প্রদর্শনীতে রেশমের পলুর যত্ন করবার বৈজ্ঞানিক উপায় দেখিয়ে অনেক পল্লীতে রেশম ব্যবসা প্রচলন করেছে।

প্রত্যেক গ্রামে এই সমিতির ঘরে বিজ্ঞাপন দেবার এক বোর্ড আছে। তা'তে গ্রামের অনেক খবর লেখা থাকে। কোনো কোনো সমিতি গ্রাম থেকে মাসিক পত্র প্রকাশ করে। অবশ্য, জাপানে অল্পকাল মধ্যে যত দ্রুত উন্নতি সম্ভব হয়েছে, আমাদের দেশে তা' হবে, এরূপ কল্পনা আমি করি না। কিন্তু দেখতে পাচ্চি, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই "পল্লী-সংস্কারের পথ ও পাথেয়" একদল কর্ম্মীর সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রগুলি থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে।

কাজের গোড়াপত্তন নির্দ্ধারণ করা একটু বিচারসাপেক্ষ। পল্লীর নানা অবস্থার উপর এ-সব নির্ভর করে; কোথাও অবৈতনিক পাঠশালা, কোথাও মালপত্র বেচা-কেনার জন্য দোকান, কোথাও হয়ত ঋণদান সমিতি বা কৃষিব্যাঙ্ক, কোথাও বা স্বাস্থ্যবিধান সমিতি সব চেয়ে প্রয়োজন। পল্লী-সংস্কারকেরা স্থানীয় অবস্থা তদন্ত ক'রে, কোন্ পল্লীতে কিসের ব্যবস্থা সবার আগে করলে সকলের সহানুভূতি পাওয়া যাবে, তা' স্থির করবেন।

সর্ব্বাপেক্ষা জরুরী হচ্চে, কৃষিজীবি, শিল্পী, কারিগর বা মজুরের সঙ্গতি লাভের উপায় আবিষ্কার করা। পল্লী ব্যবস্থা ভেঙ্গেচুরে আজ যাদের

হাতে ধনোৎপাদন ও ধনবণ্টনের কর্ত্তৃত্ব, তারা দলবদ্ধ হ'য়ে নির্ধনের সঙ্গতি লাভের পথ সঙ্কীর্ণ ক'রে দিচ্চে। এর উপায় হচ্চে, বূহ্যবদ্ধতা, জোট বেঁধে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা। বিশেষ কোনো একটা উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ একত্রিত হ'লে যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল সেও শক্তির প্রেরণা অনুভব করে। সমবায়ের দ্বারা, যে গরীব সেও উপার্জ্জনের রাস্তা খুঁজে পেয়েছে; এই উপায়েই প্রবলের হাত থেকে নিজেদের সঙ্গতি রক্ষা করবার সুযোগ পাওয়া যায়। বিচ্ছিন্ন ভাবে এক্‌লার দায় এক্‌লা বহন করবার চেষ্টা করলে দুর্ব্বলের দৈন্যদশা কখনই ঘুচ্‌বে না।

জার্ম্মান পল্লীতে সমবায় ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়েছিল ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে; আজ সে-দেশে পল্লী-প্রতিষ্ঠানের প্রাণ হচ্চে সমবায় সমিতি। জিনিষপত্র সরবরাহ করা, ফসল বিক্রী করা, গাই গরুর উন্নতি করা, শস্য মজুত রাখা, অল্প সুদে টাকা-কড়ি-কর্জ্জ পাওয়া, সকল কাজ এই সমিতির সাহায্যে সুসম্পন্ন হচ্চে। এখন ধনী ও তাহার সহচরেরা পল্লীবাসিকে বেচা-কেনার জটিল ব্যবস্থার ফাঁকে ফেলে প্রবঞ্চিত করতে পারে না; ফসলের দালালের হাত দিয়া আর তারা শস্যাদি বেচে না। কেবলমাত্র বেচা-কেনার সুব্যবস্থা নয়, কৃষিজীবির কৃষিকর্ম্মে, শিল্পীর শিল্প ব্যবসায়, কারিগরের কারখানায় যা'তে ধনোৎপাদনের ব্যাঘাত না ঘটে, সে জন্য মূলধন দেয় সমবায় সমিতি। তারপর, ক্রমে ক্রমে পল্লীর সকল প্রকার অভাব-অভিযোগ ও অসুবিধা দূর করবারও চেষ্টা হ'য়েছে এই সমবায় প্রণালীর আশ্রয়ে। জার্ম্মান কৃষি পল্লীতে শিক্ষা স্বাস্থ্যের কি আশ্চর্য্য উন্নতি হয়েছে, সে দেশের বিবরণে তা' পাঠ করে' বিস্মিত হই।

য়ুরোপে যারা শিল্পে, বাণিজ্যে ও কৃষিকার্য্যে অপেক্ষাকৃত একটু পিছিয়ে ছিল, তারা একজোট হ'য়ে নিজেদের শক্তিকে সংহত করে' অল্প কাল মধ্যে শক্তিশালী হ'য়ে উঠেছে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানি ডেন্‌দের কাছ থেকে শ্লেস্‌-উইগ-হলষ্টিন্‌ কেড়ে নিল, ডেনমার্কের ভাগে রইল খানিকটা অনুর্ব্বর জমি। জট্‌ল্যাণ্ড বালুকাপূর্ণ, সেখানে ফসল ভাল হয় না; কিন্তু আজ এইখানেই সমৃদ্ধি সম্পন্ন জোতদারদের বাসস্থান। প্রত্যেক জোতদার সমবায় সমিতির সভ্য; সবশুদ্ধ ১,৫০,০০০ ছোট ছোট জোত আছে। সকলে মিলে এরা নিজেদের সঙ্গতি বৃদ্ধি করেছে; প্রতি বছর পঁচিশ কি ত্রিশ কোটি টাকার মাখন, ডিম, ইত্যাদি এরা ইংলণ্ডে ও আয়র্ল্যাণ্ডে রপ্তানি করে।

ইতালি, ফ্রান্স, বেলজিয়ম্‌, হল্যাণ্ড, আয়র্ল্যাণ্ড, রুমেনিয়া সব দেশেই সমবায় প্রণালী প্রবর্ত্তিত করে' পল্লীসমাজ শক্তির প্রেরণা লাভ করেছে।

কিন্তু, এ-কাজের সার্থকতা কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দ্বারা হ'তে পারে না; আয়র্ল্যাণ্ডে যাদের উদ্যোগে কৃষি-সমবায় সমিতি সমস্ত দেশে বিস্তারলাভ করেছিল, তারা রাজকর্ম্মচারী ছিলেন না।

আমাদের দেশে সমবায় সমিতির কাজ সুরু হয়েছে ১৯০৪ সাল থেকে। সমিতির সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি হচ্চে, মূলধন স্বরূপ অনেক টাকা খাট্‌ছে, কিন্তু আয়র্ল্যাণ্ডের পল্লীসমাজে উন্নতির যে-সকল লক্ষণ দেখা যাচ্চে আমাদের দেশে তা' এখনও অভাবনীয়। অথচ, জোট বেঁধে নিজেদের স্বার্থরক্ষা ও সমিতির উপায় করা এদেশের পক্ষে কিছু নূতন ব্যবস্থা নয়; মাদ্রাজে 'নিধি' বলে' একপ্রকার সমিতি প্রচলিত ছিল, তারা চাঁদা তুলে একটা সাধারণ ফণ্ড করে' টাকা কর্জ্জ নেবার ব্যবস্থা করত; একত্রে চাষ করা, দশ জনে মিলে একটি আঁকমাড়া কল ব্যবহার করা, এই-সব ব্যবস্থা বহু কাল থেকেই চলে আস্‌ছে।

আজ দেখছি সমবায় সমিতির কাজ ভাল চল্‌ছে না। এর একটি কারণ দেশের লোকের ঔদাস্য। তারা সমবায় সমিতির উদ্যোগটাকে নিজস্ব করে' নেয় নি,—সরকারী আফিসের নেতৃত্বেই এর কাজ চল্‌ছে। পল্লী-সংস্কারকদের প্রথম কাজ হচ্চে সমবায় সমিতি স্থাপন করা; যদি তারা তাদের কেন্দ্রে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে' বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গতিলাভের কোনো একটা পন্থা দেখিয়ে দিতে পারেন, তবে বিচ্ছিন্ন পল্লীজীবনের ঐক্য সূত্রটি ক্রমশঃ ধরা পড়বে। এই বইয়ের ভূমিকায় কবি রবীন্দ্র নাথ বলেছেন যে আমাদের দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে সমবায়ের উপর।

সপ্তম প্রস্তাব

এ-কথা যেন কেউ মনে না করেন যে সমবায় সমিতি পরিচালনা করলেই পল্লী-সমস্যার সমাধান হবে। সর্ব্বপ্রকার সংস্কার যে পরস্পর সাপেক্ষ; কোনো একটা বিষয়ের উপর আমাদের দুর্গতির প্রতিকার নির্ভর কর্‌ছে না।

পল্লী-সংস্কার কেন্দ্রের কর্ম্ম পদ্ধতি সম্বন্ধে গোটাকয়েক প্রস্তাব কর্‌ছি :—

১। যে গ্রামগুলি নিয়ে কেন্দ্র স্থাপিত হবে, তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সঙ্গতি লাভের উপায়, সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে তদন্ত করা। কি ভাবে তদন্ত

করা যেতে পারে, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সে বিষয়ে কিছু বলা হয়েছে। সার্ভে-রিপোর্টের উপর কেন্দ্রের কার্য্যপ্রণালী নির্ভর করবে।

২। একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করা। অল্প কয়েক বিঘা জমি হ'লেই চল্‌বে। স্থানীয় কৃষি অবস্থার উপর এই কৃষিক্ষেত্রের কাজকর্ম্ম নির্দ্ধারণ কর্‌বে।

৩। ভাল বীজ সরবরাহ করা; সরকারী বিভাগের সঙ্গে মিলে এই ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যতদূর সম্ভব সস্তা দরে বীজ দেওয়া চাই।

৪। মিতশ্রমিক যন্ত্রাদি ব্যবহারের উদ্যোগ করা। অল্প জমিতে এর ব্যবহার সম্ভব নয়, কিন্তু কৃষিজীবিদের সমস্ত জমি মিলিয়ে মিতশ্রমিক কোনো কৃষিযন্ত্র ব্যবহার করলে অনেক খরচ বাঁচে; একবার এর উপকারিতা বুঝতে পারলে কৃষকেরা আপনা থেকে আগ্রহ প্রকাশ করবে। তাঁতিরাও এক সঙ্গে জোট বাঁধলে কলের তাঁত বসাতে পারে।

৫। কুটির শিল্পগুলির বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করা এবং কোন্ কোন্ শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, তার চেষ্টা করা।

৬। কৃষিজীবীর ফসল, শিল্পীর পণ্য দ্রব্য, কারিগরের মাল-পত্তর বিক্রীর সুব্যবস্থা করা। এজন্য সমবায় বিক্রয় সমিতি স্থাপন করা দরকার; উপযুক্ত দাম না পাওয়া গেলে মাল গুদামজাত করে রাখার ব্যবস্থা এই সমিতি কর্‌তে পারে।

৭। পল্লীর আবশ্যকীয় তৈজসপত্র কাপড়াদি খরিদ কর্‌বার ব্যবস্থা করা।

৮। সঙ্গতিলাভের পথ আবিষ্কার করার প্রধান আবশ্যক হচ্চে মূলধন। যা'তে চাষবাস অথবা শিল্পদ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য কিছু টাকার প্রয়োজন হয় ঋণদান সমিতি স্থাপন করে' তা'র ব্যবস্থা করা। যারা টাকা ধার নেবে পাছে তারা বৃথা ব্যয় করে সেদিকে দৃষ্টি রাখা।

৯। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লোক্যাল্ বোর্ড বা মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষদের সহায়তায় রাস্তাঘাটের সুবিধা করে' দেওয়া। কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্থানিক সায়ত্ত শাসনের সঙ্গে যোগ রক্ষা করতে চেষ্টা করবেন।

১০। পল্লীশিক্ষার জন্য পাঠশালা ও মক্তব স্থাপন করা।

১১। কথকতা যাত্রা ইত্যাদি প্রচলন করা।

১২। পল্লীর প্রতি উৎসবানুষ্ঠানে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা।

১৩। স্বদেশী মেলাগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ (organised) করে' তোলা। মেলা উপলক্ষে কৃষি-প্রদর্শনী খোলা।

১৪। পল্লীবিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকাদি রচনা করা। গ্রামের মধ্যে যে-কৃষিজীবির চাষবাস ভাল, যে তাঁতি কাপড় ভাল বোনে, যে গোয়ালা গাই গরু পালন করে' রোজগার করছে, তাদের জীবনী সংগ্রহ করা।

১৫। পল্লীতে প্রচলিত ছড়া, গান, রূপকথা ও কাহিনী সংগ্রহ করা।

১৬। পল্লীর ছেলেদের খেলাধূলার সুব্যবস্থা করা। কোনো কোনো মেলা উপলক্ষ্যে ব্যায়াম প্রদর্শনীও খোলা যেতে পারে।

১৭। শালিসী বিচার-ব্যবস্থার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা।

১৮। স্বাস্থ্যরক্ষা করার জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষদের সহায়তায় যতদূর সম্ভব, স্বাস্থ্যহানির কারণ দূর করা।

১৯। গোচারণ মাঠ পাবার চেষ্টা করা। গো-খাদ্যের অভাব থাক্‌লে তা'র জন্য কোন ফসল (fodder) উৎপন্ন করা যায় কিনা সে-বিষয় অনুসন্ধান করা।

২০। গো-ব্যাধির প্রকোপ যা'তে বৃদ্ধি না পায়, যা'তে পশুচিকিৎসার সুব্যবস্থা হ'তে পারে, সে-জন্য পল্লীসংস্কার কেন্দ্রের বিশেষ মনোযোগী হওয়া দরকার।

২১। পশু ও ফসলের বীমা (Insurance) প্রচলিত করবার উদ্যোগ করা।

২২। পল্লীর যুবকদের নিয়ে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করা।

২৩। পল্লী-সংবাদাদি জিলার কোনো সংবাদ পত্রে প্রকাশ করা। অন্যান্য পল্লীর ও দেশের সংবাদের সারমর্ম্ম পল্লীতে প্রচার করবার ব্যবস্থা করা।

২৪। গোষ্ঠীজীবনের (Communal life) যদি কোনো প্রতিষ্ঠান্ পল্লীতে থাকে, তা'র সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করা এবং এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান্ মঠ, মন্দির, হরিসভা, ইত্যাদি কি-ভাবে চল্‌ছে তার বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা।

২৫। 'রায়ত সভা' স্থাপন করা।

কাজে নাম্‌লে 'পল্লীসংস্কার সমস্যা' ক্রমশই স্পষ্ট বোধগম্য হ'বে ; তখন আরো অনেক পথ আমরা চোখে দেখ্‌তে পাব। বাঁধি কোনো ধারা (formula) অবলম্বন করা যায় না ; অবস্থা ভেদে কর্ম্মধারা নানা দিক্ দিয়ে নানাভাবে বিস্তার লাভ করে। 'পথ কি' তার ঠিকানা জান্‌বার অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন ; চল্‌তে সুরু করলে পথ আপনা হ'তেই চোখে পড়বে।

পল্লীসংস্কারের 'পথ' কি, এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই পাথেয়র কথা ওঠে। বারম্বার এই কাজে হাত দিতে গিয়ে আমরা অর্থাভাবে সমস্ত শ্রম ব্যর্থ করেছি;

ভিক্ষার অনুগ্রহে বা দানের অনুকম্পায় কোনো প্রতিষ্ঠান্ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। অতএব, কোন্ উপায়ে পল্লীসংস্কারের কাজে অর্থ সংগৃহীত হ'তে পারে তাহাই আলোচ্য।

গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানের ভিত্তির উপর ভর করে' যখন পল্লীসমাজ দাঁড়িয়েছিল, তখন তার অর্থ-সম্পদ পাওয়া যেত গ্রাম থেকে। গ্রামের মণ্ডপ তৈরী হ'ত সমস্ত গ্রামবাসীদের টাকায়; পূজার বাড়ীর সঙ্গে পান্থশালা, পাঠশালা, টোল প্রভৃতির ব্যবস্থাও ছিল। এই সকল প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন ব্যয়ভারও গ্রামের লোক বহন করত। পয়সা কড়ি দেওয়ার সুবিধা না হ'তে পারে, এই জন্য ধান চাল তরকারী, ফলমূল, গুড় চিনি প্রভৃতি 'ভোগ' দেওয়ার প্রথা ছিল, এখনও আছে। এই 'ভোগের' দ্বারা অতিথিশালার আহার্য্য, পূজারীদের প্রয়োজন, এমনকি টোল ও পাঠশালার পণ্ডিতদের দো-বেলার আহার সংগৃহীত হয়।

এ-ছাড়া গ্রামের বিদ্যালয় পরিচালনার্থ টাকা বা শস্য বরাদ্দ থাকে। শস্য ওজন করে' নেওয়ার ভার যার উপর ন্যস্ত করা হয়, তাকে "কয়াল" বলে। প্রতি বছর বারোয়ারী মেলার দিন কয়াল নির্ব্বাচিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাঁদাকে "মারচা" বলে। তারপর, গ্রামের উৎসবাদির ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য এমন একটি সুব্যবস্থা বহুকাল থেকে চলে আস্‌ছে যে বারোয়ারী, যাত্রা, কীর্ত্তন, কথকতা, প্রভৃতির আয়োজনের জন্য কারো ভাব্‌তে হয় না। আর, এই-সব উপলক্ষ্যে গ্রামের ঘর বাড়ী রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার ব্যয়ভার গ্রামের লোকেরাই বহন করে।

পল্লীসমাজের এই 'ব্যবস্থাগুল' থেকে বোঝা যায়, আজ যা'কে Communal finance বলা হয়, আমাদের গ্রাম্য প্রতিষ্ঠান তার সাহায্যেই চল্‌ত। অবশ্য' বাংলা দেশে নানা ঐতিহাসিক কারণে মণ্ডলী তেমন ভাল করে' গড়ে উঠ্‌তে পারে নি। চারিদিক থেকে নানা জাতি, নানাবর্ণ বাংলা দেশে আশ্রয় নিয়েছিল; সামাজিক জীবনের প্রতিষ্ঠা heterogeneous অর্থাৎ বিচিত্র উপাদানের উপর গড়ে উঠ্‌তে পারে না। তাই যেখানে homogeneity অর্থাৎ এক শ্রেণীর মাল মসলা পাওয়া গেছে সেখানে সামাজিক ব্যবস্থা সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে পেরেছে।

কিন্তু উপরে Communal finance এর যে সব দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল এই থেকেই মনে হয়, উদ্যোগী হ'লে আজও এই পথ অবলম্বন করে আমাদের পাথেয় সংগৃহীত হ'তে পারে।

আশ্চর্য্য এই, জাপানে পল্লী-সংস্কার এই করেই সুরু হয়েছে।

সেখানেও ছেলেমেয়ের জন্মোপলক্ষে, বিবাহে, পোষ্যপুত্র-গ্রহণকালে, প্রতি গ্রামবাসীকে "সাধারণ ফণ্ডে" টাকা দিতে হয়। প্রতি গৃহস্থ ছেলেমেয়ের জন্মোপলক্ষে একটি গাছ রোপণ করে; এই গাছ সাধারণের সম্পত্তি। যখন গাছটি কুড়ি ফুট উঁচু আর তিন ফুট মোটা হয়, তখন মোড়লেরা এসে কেটে নেয় এবং গাছ বেচে টাকা "সাধারণ ফণ্ডে" জমা দেয়। একটি গাছের দাম প্রায় ত্রিশ ইয়েন্ পড়ে। প্রতি গ্রামে "যুবক সমিতি" ও ধর্ম্ম পুরোহিত "সাধারণ ফণ্ড" আদায়ের ব্যবস্থা করে।

আমাদের দেশেও এই ধরণের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে "সাধারণ ফণ্ডের" কর্ত্তৃত্ব পড়ে জমিদারী সেরেস্তায়। এ-ক্ষেত্রে এই টাকার যে সদ্ব্যবহার হবে' এমন আশা করা যায় না। প্রতি গ্রামে আমি যে কেন্দ্র গঠনের প্রস্তাব করেছি, যদি তা' সম্ভব হয়, তবে কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষদের হাতে "সাধারণ ফণ্ডের" দায়িত্ব ভার ন্যস্ত করা নিরাপদ। মুসলমান জোলাদের মধ্যে "মিলাড্ সরিফের" ব্যয় তাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির হাতে; মক্তব ও মস্জিদের জন্য মুসলমানেরা কর (tax) বসায়,—এই টাকার ব্যবস্থাও সম্পূর্ণভাবে মস্জিদের কর্ত্তৃপক্ষদের উপর থাকে।

কি-উপায়ে পল্লী-সংস্কারের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হ'তে পারে এই সমস্যা নিয়ে বন্ধুমহলে আলোচনা করে' যে-কয়েকটি প্রস্তাব পাওয়া গেছে, এইখানে তা' উল্লেখ করছি—

১। 'আবওয়াব' জমিদারী-সেরেস্তায় না দিয়ে সেই পরিমাণ টাকা 'সাধারণ ফণ্ডে' দেওয়া। জমিদারের ন্যায্য পাওনার অতিরিক্ত আদায়কে 'আব্ওয়াব' বলা হয়। এই টাকার পরিমাণ নেহাৎ কম নয়; 'গ্রাম্য-সমিতি' গুলি উদ্যোগী হ'য়ে কাজে প্রবৃত্ত হ'লে আমার বিশ্বাস প্রত্যেক গৃহস্থ আব্ওয়াবের টাকা সমিতির হাতে দেবে।

২। বিবাহ, শ্রাদ্ধ ও জাতকর্ম্ম প্রভৃতি উপলক্ষ্যে কিছু চাঁদা দেওয়া। চাঁদার হার নির্ভর কর্‌বে গ্রামের অবস্থার উপর; পল্লী-সংস্কার সমিতি গ্রামের প্রধান ও মাতব্বরদের সঙ্গে পরামর্শ করে' স্থির করবে।

৩। প্রত্যেক তাঁতি তাঁত-পিছু, জেলে জাল-পিছু, গোয়ালা গাই-পিছু, কামার মাসিক আয়ের উপর অল্প কিছু কর (tax) দিতে পারে।

৪। গ্রাম থেকে যত গাড়ী বা নৌকা খড় বাইরে যায়, তার উপর দু' আনা কর ধার্য্য করা যেতে পারে।

৫। প্রতি বিঘা ধানী জমির উপর অন্ততঃ দু' সের চাল আদায় হলে গ্রামের অন্ধ, আতুর উপার্জ্জনক্ষমদের অন্ন সংস্থান হ'তে পারে।

৬। পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষে প্রতি গৃহস্থকে অবস্থানুসারে "সাধারণ ফণ্ডে" টাকা দিতে হবে।

৭। পল্লী-সংস্কার সমিতির উদ্যোগে দু'-পাঁচটা গ্রাম মিলে "প্রদর্শনী" খোলার প্রস্তাব ইতিপূর্ব্বে করা হয়েছে। এই প্রদর্শনীতে নিশ্চয়ই কিছু অর্থাগম হবে; প্রতি বৎসর এই উপায়ে সাধারণ ফণ্ডের কিছু আয় হতে পারে, সন্দেহ নাই,

৮। যে-জমিদারের এলাকার অধীনে পল্লী-সংস্কার সমিতি কাজ করবে, সেই জমিদারের হস্তবুদ জেনে তার উপর শতকরা একটাকা মাত্র কর (tax) আদায়ের চেষ্টা করা যেতে পারে।

৯। গ্রাম নিবাসী কোনো শিক্ষিত যুবক অর্থোপার্জ্জন করতে আরম্ভ করলে, তার বাৎসরিক আয়ের উপর শতকরা ৬৲ হিসাবে পল্লী-সংস্কারের কাজে দেবার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করার চেষ্টা করা সঙ্গত। এই দাবী কিছু অসম্ভব নয়; শিক্ষিত যুবকদের কাছ থেকে আজ এতটুকু স্বার্থত্যাগ আশা করা যেতে পারে।

১০। প্রতি গৃহস্থ প্রতি বৎসর তার ভিটামাটিতে দু'-একটা গাছ রোপণ করবে। পল্লী-সংস্কার সমিতির সাহায্যে গাছ বিতরণ করা হবে। এই গাছ সাধারণের সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ সাধারণ ফণ্ডে জমা হবে।

১১। পল্লী-সংস্কার সমিতির উদ্যোগে সমবায় সমিতি (co-operative societies) স্থাপিত করার প্রস্তাব ইতিপূর্ব্বে করা হয়েছে। এই সকল সমিতির লাভের কিয়দংশ সাধারণ ফণ্ডে দেওয়া হবে।

১২। গ্রামে পানাপুকুর, স্যাওলায় ভরা দিঘী ও অপরিস্কৃত ঝিলের অভাব নেই। জমিদারের কাছ থেকে জমা নিয়ে 'মাছের চাষ' করবার ব্যবস্থা করলে আয়ের একটা পথ হবে; গ্রামের স্বাস্থ্য রক্ষারও একটা উপায় হবে।

পল্লী-সংস্কার সমিতির যুককেরা তাদের জীবিকার্জ্জনের সংস্থান যতদূর সম্ভব কৃষি ও শিল্প কর্ম্ম দ্বারা নির্ব্বাহ করতে সচেষ্ট থাক্‌বেন। কর্ম্মীর দল উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে' এ-কাজে মন দিলে বৈজ্ঞানিক যুগে নিস্ফল হবার কোনো কারণ নেই। কাজে হাত দিবার জন্য কিছু জমি, কিছু মূলধন, আর কিছু ব্যবসা বুদ্ধি চাই; জাপানী পল্লী-সংস্কারকেরা যে উদ্যম ও দৃঢ়তার সঙ্গে এই ব্রতে ব্রতী হয়েছেন, আমাদের দেশে এক দল যুবক সেই সংকল্প নিয়ে কাজে প্রবৃত্ত হ'লে পথ ও পাথেয় দুই-ই মিল্‌বে।

অষ্টম প্রস্তাব

অনেক দিন পূর্ব্বে রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়ে যখন বিভিন্ন দলের মধ্যে আত্মবিপ্লব ঘটেছিল, সেদিন দেশের বিক্ষিপ্ত চিত্তধারাকে কর্ম্মসাধনার ক্ষেত্রে প্রবাহিত কর্‌বার জন্য রবীন্দ্রনাথ সকলকে আহ্বান করেছিলেন। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ (organised) করবার জন্য তিনি বলছিলেন, "প্রথমে সকল প্রকার তথ্য সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিবে—কারণ কর্ম্মের ভূমিকাই জ্ঞান। যেখানে কাজ করিতে হইবে সর্ব্বাগ্রে তাহার সমস্ত অবস্থা জানা চাই।"

এক একবার এই প্রশ্ন মনে জাগে, কি কারণে সমস্ত দেশের চিত্ত বারম্বার উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌লেও যথার্থ কর্ম্ম প্রবর্ত্তনার বিশেষ কোনো দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। আসল কথা, দেশের ভিৎ গড়ে তুলবার শক্তি সামর্থ্য এমন বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে যে, দেশের হৃদয়ে এই শক্তি যেন কোনো কাজ কর্‌তেছে না। অতএব, প্রথমতঃ যে মাটির উপরে ভিৎ তুল্‌তে হবে, তার প্রকৃতি সম্যক্‌রূপে নির্দ্ধারণ করা অত্যাবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ কি উপায়ে বিচ্ছিন্ন শক্তিকে ও উপকরণকে কেন্দ্রীভূত করে বর্ত্তমান যুগের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে জীর্ণ পল্লী সমাজের সংস্কার সাধন করা যেতে পারে তা ভাব্‌বার সময় এসেছে। কিন্তু পথ ও পাথেয় নির্দ্দেশ করবার পূর্ব্বে প্রকৃত অবস্থার বিস্তারিত অনুসন্ধান করা চাই। লক্ষণগুলি ভাল জানা না থাক্‌লে যেমন কোনো কঠিন ব্যাধির প্রতিকারের চেষ্টা সফল হয় না, পল্লী-জীবনের কেন্দ্রে কোন্‌খানে দুর্গতির মূল তা অনুসন্ধান না করে পল্লী-সংস্কারের কাজে সার্থকতা লাভ হবে না।

এই মনে করে কয়েক বছর পূর্ব্বে কতকগুলি প্রশ্ন ছাপিয়ে বাংলাদেশের পল্লীসমাজের তথ্য-সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেছিলাম। আশা ছিল, শিক্ষিত ও ভূস্বামী সম্প্রদায় এ কাজে বিশেষ সাহায্য করবেন; কিন্তু পাঁচ ছ'মাস চেষ্টা করেও সন্তোষজনক ফল পাই নি। কংগ্রেসের সাহায্যে এ কাজ হ'তে পারত, কিন্তু পূর্ণ স্বরাজের প্রতীক্ষায় তারা উৎকণ্ঠিত; এমন সময়ে অন্য

কোনো কাজে বিত্ত বিক্ষিপ্ত করা সঙ্গত নয়। তাই কংগ্রেস কর্ম্মীদের এ কাজে পাওয়া গেল না। কিন্তু এ কাজে সায় পেয়েছিলাম বাংলার প্রিয় কবি রবীন্দ্রের কাছ থেকে। তিনি আমার প্রশ্নাবলীর ভূমিকায় যা' লিখেছিলেন নিম্নে তা' উদ্ধৃত করছি :—

"দেশের সেবা সত্যভাবে কর্‌তে হবে, এই উৎসাহ সৌভাগ্যক্রমে আজ বাঙালী যুবকের মনকে বিচলিত করেচে। প্রখর উত্তেজনাতপ্ত বাক্যের মরীচিকারূপে তাঁরা দেশের মূর্ত্তি দেখ্‌তে চান না, দেশের যেখানে ক্ষুধাতৃষ্ণা বেদনা, যেখান থেকে দেশ প্রাণ দেয় এবং প্রাণ দাবী করে সেই পল্লীনিকেতনে দেশের বাস্তব সত্তাকে প্রত্যক্ষ কর্‌বার ইচ্ছা জেগেচে।

সেবার দ্বারাতেই প্রীতি সার্থক হয়। পল্লীর ক্ষীণ প্রাণকে পূর্ণ করে দেওয়ার দ্বারাই আজ আমাদের দেশসেবা সত্য হবে এই কথাটি দেশের যুবকদের মনে লেগেছে ব'লে বোধ করচি। কাজের ক্ষেত্রটি কোথায় তা তাঁরা বুঝেছেন। এমন শুভ অবসর ব্যর্থ হবে যদি কাজের ক্ষেত্র সম্বন্ধে আমাদের পরিচয় অস্পষ্ট ও আনুমানিক হয়। দুর্গতির কারণগুলি সম্পূর্ণভাবে ও যথাযথভাবে জান্‌তে হবে।

এই জানার কাজটি উত্তেজনার কাজ নয়, অভিনিবেশের কাজ। এ'তে মাদকতা নেই, সাধনা আছে। এ জন্য এ কাজ কঠিন। এই কঠিন কাজের অপেক্ষা বহুদিন ছিল কিন্তু মন প্রস্তুত ছিল না। আজ মন জেগেছে, তাই আশা করি দেশের সত্য আবেদন ব্যর্থ হবে না, চিত্তবিক্ষেপের দ্বারা শক্তির অপব্যয় হবে না।

উদ্যোগ পর্ব্বের আরম্ভে সন্ধানের কাজ। আজকের দিনে সন্ধানের দ্বারা যিনি কাজের পথকে পরিষ্কৃত করে দেবেন, কালকের দিনের মহা সিদ্ধি তাঁকে বরমাল্যে পুরস্কৃত কর্‌বে। কিন্তু তার সব চেয়ে বর পুরস্কার এই যে, দেশজ্ঞানের মধ্যে তাঁর দেশপ্রীতি প্রতি মুহূর্ত্তে আপন আশ্রয় বিস্তার কর্‌তে থাক্‌বে, যে অজ্ঞান আবরণের অন্তরালে তাঁর দেশ কাছে থেকেও তাঁর পক্ষে বহু দূরে, সেই আবরণ তাঁর প্রতি মুহূর্ত্তের প্রয়াসে অপসারিত হতে থাক্‌বে। বিশ্বকর্ম্মা তাঁর দৃষ্টিতে শক্তি দিন, তাঁর অধ্যবসায়কে মোহমুক্ত করুন, তাঁর সাধনায় দেশের ভাবী সার্থকতার প্রশস্ত পথ হোক।"

এই তথ্য সংগ্রহের কাজে আমি বাংলার তরুণ কর্ম্মীদের আহ্বান করছি। আমি নিশ্চয় জানি, গ্রামবাসীদের মধ্যে যারা লেখাপড়া জানেন, তারা এই কাজে বিশেষ সাহায্য করবেন। স্কুল-কলেজ ছুটির সময় এক দল ছাত্র এ কাজে মনোনিবেশ করতে পারেন। তথ্যসংগ্রহকারীদের কাছে এই কাজের

প্রণালী সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলে, প্রশ্নগুলি আরম্ভ করব। প্রশ্নাবলীর সংখ্যা দেখে কেহ যেন ভীত না হন্। জীর্ণ পল্লীসমাজের জীবনযাত্রার সকল দিক আলোচনা কর্বার উদ্দেশ্যে সকল বিষয় প্রশ্ন করা হয়েছে, কিন্তু যিনি যতগুলি প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করতে পারবেন তাতেই কিছু না কিছু কাজ হবে। আর একটি অনুরোধ, এই কাজটাকে কেউ যেন কোনো রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত ক'রে না লন্। বস্তুতঃ এ কাজ কোনো বিশেষ দলের নহে; দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় পরস্পরের সাহায্যে বাংলাপল্লীর প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান করবেন—এই ক্ষেত্রে বাদ-বিসম্বাদ ও তর্ক-বিতর্ক কিছু উঠ্‌তে পারে না।

১। সর্ব্বপ্রথমে গ্রামের চৌহদ্দি ও বিশিষ্ট স্থানগুলি—যথা, দেবালয়, মসজিদ, বারোয়ারী তলা, হরিসভা, জমীদারের কাছারী, হাট, পাঠশালা ইত্যাদি নির্দ্দেশ করে একটি মোটামুটি নক্সা করা প্রয়োজন।

২। প্রশ্নগুলির উত্তর একখানি নোটবুকে সংগ্রহ কর্‌লে ভাল হয়। গ্রামবাসীদের কাছে এই তথ্য-সংগ্রহের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন; নতুবা তাদের মন হতে সন্দেহ ঘোচান যাবে না।

৩। গ্রামের সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ স্থাপন করে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলে অনেক তথ্য-সংগ্রহ করা সহজসাধ্য হবে। গ্রামের পঞ্চায়েৎ, প্রধান প্রজা, জমিদারের সেরেস্তার কর্ম্মচারী, পুরোহিত, মৌলবী প্রভৃতির সাহায্য প্রার্থনা কর্‌তে হবে।

৪। গ্রাম সম্বন্ধে সরকারী নথা-পত্রে যে সকল তথ্য পাওয়া যেতে পারে, যতদূর সম্ভব তা সঙ্কলন করবার চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়।

৫। বলা বাহুল্য, অনেক তথ্য সঠিক জানা যাবে না; তবে আনুমাণিক অঙ্ক বসাবার পূর্ব্বে যতদূর সম্ভব খোঁজ খবর লওয়া প্রার্থনীয়। কোনো প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব না হলে, কি কারণে পাওয়া গেল না তাহা লিখে রাখা ভাল।

৬। সুবিধা হলে দৃষ্টান্তরূপে গ্রামের কোনো কোনো বিশেষ অবস্থার ছবি তুলে রাখা ভাল।

৭। গ্রামের ছোট-বড় সকল অবস্থার বাসিন্দা মধ্যে দুই চারি জন গৃহস্থের বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করা বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্নাবলী।

ভূমিকা—

১। গ্রামের নাম

২। থানা

৩। মহকুমা

৪। ডাকঘর

৫। জেলা

৬। রেল-ষ্টেশন হইতে কতদূর ?

ভৌগোলিক তথ্য—

৭। গ্রামের পাশে নদী বা খাল আছে কি না ?

৮। নদী বা খালে সব সময় জল থাকে কি না ? নদীর প্রকৃতি কি ?

৯। কতদূরে নদী ? ক'টা নদী ? বিল ?

১০। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ? এই অঞ্চলে বন্যা হয় ? প্রতি বছর ? আকস্মিক ?

১১। গ্রামের ভিতরে ও বাহিরে বন-জঙ্গল আছে কি না ?

জনসংখ্যা—

১২। মোট লোকসংখ্যা ? কত স্ত্রী, কত পুরুষ, কত ছেলে (৬—১৪)

১৩। কত মেয়ে (৭—১২) ? "Density of population" কত ?

১৪। হিন্দু মুসলমানের আপেক্ষিক পরিমাণ ?

১৫। গ্রামে হিন্দুদের কোন্ কোন্ জাতির বাস ? তাদের প্রত্যেকের সংখ্যা ?

১৬। গ্রামের মোট লোকসংখ্যা বেড়েছে কি কমেছে ? কমে থাক্‌লে তার কারণ কি ?

১৭। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে আপেক্ষিক প্রজাবৃদ্ধির তারতম্য এবং সেই তারতম্যের কারণ কি ?

১৮। কত লোকের জীবিকা কেবলমাত্র চাষবাস ? কেবলমাত্র কোনো ব্যবসা বা শিল্প ?

১৯। কত জনের চাষ ও গৃহশিল্প এই দুই উপায় আছে ?

২০। চাষের উপর নির্ভর করে ক'জন ? (স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে সব হিসাব করিবেন)

২১। কত জনের ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ?

২২। কত জন বিদেশী (অর্থাৎ যারা গ্রামের বাসিন্দা নয়) গ্রামে আছে ? তারা কি করে ?

জমি—

২৩। গ্রামের আয়তন (area) কত ?

২৪। মোট চাষের জমি কত ?

২৫। কত বিঘা অ-নাবাদী ? গোচারণ ? আবাদযোগ্য অথচ অনাবাদী ?

২৬। কত বিঘা জঙ্গল, বন ইত্যাদি ?

২৭। ফলের বাগান ?

জমি-বিলি—

২৮। 'খাসে' জমিদার কত বিঘায় কি করেন ?

২৯। প্রজাবিলি মোট জমি কত ?

৩০। নিজের জমি নিজেই চাষ করে এমন কজন আছে ?

৩১। ভাগে জমি চাষ করে এমন কজন আছে ?

৩২। জমির মালিক (ownership) ক'জন ?

৩৩। প্রজা বন্দোবস্তের (Tenancy) অধীনে ক'জন ?

৩৪। মালিকদের জমির, গড়পড়তায়, আয়তন কত ?

৩৫। প্রজাদের জমির, গড়পরতায়, আয়তন কত ?

৩৬। মালিকদের ও প্রজাদের জমি চাষে কোনো তারতম্য লক্ষিত হয় কিনা ?

৩৭। গ্রামে জমিজমা নেই, এমন লোক কত আছে ?

খাজনা—

৩৮। খাজনার হার কত ? নগদ ? ফসল ?

৩৯। মোট নগদ আদায় কত ? (হস্তবুদ)

৪০। নির্দ্দিষ্ট খাজনা ব্যতীত জমিদারকে আর কত দিতে হয় ?

৪১। খাজনার কিস্তী ক'টা ? কিস্তী খেলাপের সুদ কত ?

৪২। নিরিখ-ধার্য্যের প্রণালী কি ?

৪৩। গত বিশ বৎসর মধ্যে নিরিখ বৃদ্ধি হয়েছে কিনা ? কত বৃদ্ধি ?

কৃষি—

৪৪। কি কি প্রধান শস্য জন্মে ? বিঘাপ্রতি কত বীজ বোনে ?

৪৫। কোন্ শস্যে কত বিঘা জমি ?

৪৬। একই জমিতে দুই ফসল হয় এরূপ কত বিঘা ?

৪৭। একই জমিতে তিন ফসল হয় এরূপ কত বিঘা ?

৪৮। কোন্ শস্যের কত ফলন (yield) ?

৪৯। গত দশ বছরের তুলনায় এখন ফসল বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা ?

৫০। কোন্ ফসলের কত বৃদ্ধি ? বা কত কম ?

৫১। কত বছর হ'ল পাটের চাষ আরম্ভ হয়েছে ?

৫২। পাটের ফসলে কৃষিজীবিরা যদি লাভবান্ হয়ে থাকে, তবে সেই টাকায় তারা আর্থিক উন্নতির জন্য কি কিছু করেছে ?

৫৩। কৃষি উন্নতির জন্য কি করা যেতে পারে, এ বিষয় গ্রামবাসীদের মত কি ?

৫৪। পাটের চাষীরা কোথায় পাট জাগ দেয় ?

৫৫। চাষীরা "বীজ-ধান" কেমন ক'রে রাখে ? সাধারণতঃ কোন্ জাতের ধান বোনে ?

কৃষি-প্রণালী

৫৬। কি ধরণের লাঙ্গল ? অন্যান্য কৃষিযন্ত্র কি কি ব্যবহৃত হয় ?

৫৭। একখানা লাঙ্গল দিনে (Working hours) ক' বিঘা জমি চষে ?

৫৮। ভাড়া করা হালের রোজ কত ?

৫৯। জল সেচনের ব্যবস্থা ? জল নিকাশের ব্যবস্থা ?

৬০। মোট হালের গোরু এবং মহিষ কত ?

৬১। কি কি সার ব্যবহৃত হয় ?

৬২। কি পরিমাণ গোময় (Cowdung) জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয় ?

৬৩। সবুজ সার (Green manures) ব্যবহৃত হয় কিনা ? শিম্বী জাতীয় (Leguminosce) কোন্ কোন্ ফসলের চাষ হয় ?

৬৪। বিঘা প্রতি কোন্ ফসলের চাষে কত খরচ হয় ? মোটের উপর কত লাভ থাকে ? কোনো বন্য জন্তুর উপদ্রবে ফসল নষ্ট হয় কিনা ?

উন্নত কৃষি-প্রণালী—

৬৫। গত দশ বছরের তুলনায় এখন চাষবাসের উন্নতি দেখা যাচ্ছে কিনা ?

৬৬। বিশেষ কি উন্নতি হয়েছে ?

৬৭। ভাল ধানের বা পাটের বীজ কৃষিজীবিরা পায় কিনা ? কোথা থেকে পায় ? কি দরে ?

৬৮। সরকারী কৃষি বিভাগের কোনো সাহায্য গ্রামবাসীরা পায় কিনা ?

৬৯। কৃষি-উন্নতিবিধায়ক কোনো প্রস্তাব চাষীরা কি ভাবে গ্রহণ করে ?

গোরু বাছুর—

৭০। গাই গোরুর সংখ্যা কত ? গড়ে কত দুধ হয় ? দুধের দাম ?

৭১। গো-চারণ জমি কত আছে ?

৭২। গোরু-বাছুরের খোরাকী কি কি জিনিষ গ্রামে কত পরিমাণ পাওয়া যায় ?

৭৩। কোন্ হাট থেকে গ্রামের লোকেরা গোরু বাছুর কেনে ? কত দরে ? (হালের গোরু, গাই গোরু, মহিষ, বাছুর প্রভৃতির আলাদা দাম লিখ্‌বেন)।

৭৪। গোরু-বাছুর Breed করিবার জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রামে আছে কিনা ?

৭৫। গোরুর মৃত্যু সংখ্যা বছরে কত ? প্রধান গো-ব্যাধি কি ?

৭৬। ব্যাধির প্রকোপ হ'লে চিকিৎসার কি ব্যবস্থা আছে ?

৭৭। সরকারী ও বে-সরকারী ব্যবস্থার বৃত্তান্ত ?

৭৮। গ্রামে গো-বৈদ্য আছে কিনা ? তাদের চিকিৎসা প্রণালী কি ?

৭৯। গ্রাম থেকে অনুমান কত খড় বাইরে বিক্রী হ'য়ে যায় ? কি দর ?

গ্রামের ব্যবসা—

৮০। নিত্য ব্যবহার্য্য (যথা—কাপড়, লবণ, দিয়াশলাই, তামাক, চাল, ডাল,) তৈজসপত্র কোথা থেকে গ্রামবাসীরা কেনে ?

৮১। কৃষি কর্ম্মের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কোথা থেকে সরবরাহ হয় ?

৮২। গ্রামের ফসলাদি কি পরিমাণে রপ্তানি হয় ? ব্যাপারী কারা, কত দরে কি ফসল বিক্রি হয় ?

৮৩। গ্রামের ফসলাদি কোন্ হাটে বিক্রি হয় ? বিক্রির প্রণালী কি ? দেনার জন্য ক্ষেতের ফসল আটক থাকে, এরূপ ক'জন কৃষিজীবি গ্রামে আছে ?

৮৪। গ্রামের হাট সরকারী রাস্তা হইতে কতদূর ? ষ্টেশন থেকে কতদূর ? নদী থেকে কতদূর ?

৮৫। জিনিষপত্রের আমদানী ও রপ্তানি কোন্ কোন্ পথ দিয়ে বেশী হয়?

৮৬। বেচা-কেনার জন্য সমবেত ব্যবস্থা প্রণালী আছে কিনা?

৮৭। মহাজন, পাইকার, দালাল কারা?

৮৮। গ্রামের হাট্ বাজারে স্বদেশী কি কি পণ্য পাওয়া যায়? তার কত অংশ গ্রামেই তৈরী হয়?

৮৯। বর্ষাকালে মালপত্র সরবরাহ করবার ব্যবস্থা কি?

৯০। ফসল (ধান, পাট, গম, তিসি, সর্ষে ইত্যাদি) মজুত রাখ্‌বার কোন ব্যবস্থা আছে কি? ধর্ম্মগোলা?

৯১। গ্রামে আঁকমাড়া কল ব্যবহৃত হয় কিনা? গুড় তৈরীর প্রণালী কি?

৯২। রেশমের চাষ ছিল কি?

৯৩। জেলে ব্যবসা করে এমন ক'জন আছে? কি পরিমাণ মাছ ধরে? গ্রামের বাইরে মাছ বিক্রি হয় কিনা? কোথায়?

গ্রামের অন্নবস্ত্র সমস্যা—

৯৪। গ্রামের উৎপন্ন ফসলের কত অংশ গ্রামে থাকে? যদি রপ্তানি না হয়, তা'হলে ঐ ফসলে গ্রামের প্রয়োজন মেটান যায় কিনা?

৯৫। গৃহস্থের নিত্য ব্যবহার্য্য তরকারী শাকসব্জী গৃহস্থের জমিতেই হয়, না কিন্‌তে হয়?

৯৬। দৈনিক প্রতি গৃহস্থের কত চাল ও অন্যান্য আহার্য্য কি পরিমাণ প্রয়োজন হয়, তাহার একটা মোটামুটি হিসাব সংগ্রহ করবেন।

৯৭। গৃহস্থের প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি গ্রামের তাঁতিদের কাছ থেকে পাওয়া যায়, না কিনতে হয়?

৯৮। সাধারণতঃ গৃহস্থেরা যে কাপড় পরে তার দাম কত?

৯৯। সাধারণ গৃহস্থের চালচলন (standard of living) বেড়েছে কিনা?

১০০। হাটে, বাজারে, দোকানে অনাবশ্যক জিনিষপত্রের (luxuries) আমদানী ও বিক্রয় কত?

১০১। গ্রামের কত লোক গ্রামের বাইরে বাস করে' অর্থোপার্জ্জন করে? ভিটামাটী ত্যাগ করে' অন্যত্র বা সহরে চলে গেছে, এমন কত গৃহস্থের খবর জানা গেল?

গৃহশিল্প—

১০২। গ্রামের ক'জন তাঁতি আছে? কামার? জোলা?

১০৩। মাসে মোট কত গজ কাপড় তাঁতিরা বোনে?

১০৪। কত নম্বরের সুতা ব্যবহৃত হয়? কি ধরণের তাঁত চলে? তাঁতির 'মহাজন' কে?

১০৫। গ্রামে সুতা কাটা হয় কিনা? যদি না হয় তবে তার কারণ কি? স্ত্রীলোকেরা কি করে?

১০৬। গড়ে প্রত্যেক তাঁতির কত আয়? তাঁত ভিন্ন জীবিকার্জ্জনের আর কোন উপায় আছে কিনা?

১০৭। তাঁতিরা বয়ন ব্যবসার পরিচালন করতে সমবেত চেষ্টায় বেচা-কিনা করে কিনা?

১০৮। বয়ন শিল্পের অবনতি ঘটেছে এর কি প্রমাণ?

১০৯। বয়ন ছাড়া গ্রামে আর কি কি শিল্প আছে?
(প্রতি শিল্প ব্যবসার বিস্তৃত বর্ণনা সংগ্রহ করবেন)

১১০। জাতীয় আন্দোলনের ফলে গ্রামের শিল্পাদির কোনো পরিবর্ত্তন ঘটেছে কিনা?

১১১। গ্রামে কোনো মেলা বসে কিনা?

১১২। মেলায় কতগুলি গ্রামের লোক সম্মিলিত হয়?

১১৩। মেলা উপলক্ষ্যে শিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজন হয় কিনা?

আর্থিক অবস্থা—

১১৪। গত পাঁচ বছরের তুলনায় মজুরের বেতন বৃদ্ধি হ'য়েছে কিনা? মজুরের দৈনিক কত বেতন? নগদ? ফসল?

১১৫। গত দশ বৎসরের গড়পড়তায় চাল-ডালের দামের কম বৃদ্ধি কত?

১১৬। গৃহস্থের মধ্যে ক'জন ঋণ ভারগ্রস্ত?

১১৭। গ্রামের মহাজন কারা?

১১৮। সুদের হার কত?

১১৯। ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা কি?

১২০। মহাজন বৎসরের কোন সময় টাকা আদায়ের চেষ্টা করে?

১২১। আদায় ওয়াশীলের জন্য মহাজনের সঙ্গে জমিদারী কাছারীর কোন যোগাযোগ আছে কি না?

১২২। ঋণ নাই গ্রামে এমন কজন গ্রহস্থ আছে এবং কি উপায়ে তারা ঋণভার থেকে মুক্তি পেলেন?

১২৩। গ্রামে সমবায় সমিতি আছে কিনা? থাকলে তাহার সভ্য সংখ্যা কত? কি ভাবে সমিতির কাজ চল্‌ছে, তার যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করবেন।

১২৪। সমবায় সমিতি ছাড়া আর কোনো কর্জ্জা তহবিল আছে কিনা।

১২৫। জমিদারী সেরেস্তা থেকে কর্জ্জ দেবার ব্যবস্থা আছে কি না? এই সকল ঋণ দান ব্যবস্থার পদ্ধতি কি? সুদের হার কত?

১২৬। গ্রামে মর্টগেজী জোত কত? কারা মর্টগেজ রাখে? সুদের হার?

১২৭। মর্টগেজ উদ্ধার করতে পেরেছে এমন কত গৃহস্থ আছে?

গ্রামের স্বাস্থ্য—

১২৮। গত দশ বৎসরের গড়পড়তায় জন্ম-মৃত্যুর হিসাব কি? প্রতি বছরে শিশুব মৃত্যু সংখ্যা কত?

১২৯। মাস হিসাবে জন্ম মৃত্যুর সংখ্যা (ইউনিয়ন বোর্ডেব নজীরে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যাবে)।

১৩০। বছরের কোন্ সময় ম্যালেরিয়া দেখা দেয়?

১৩১। গ্রামেব প্রধান ব্যাধি কি কি? বছরের কোন সময় তার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়? গ্রামের বসতির আবর্জ্জনা কোথায় জমা করা হয়? মলমূত্রাদি কোথায় কি ভাবে পরিষ্কার করা হয়?

১৩২। গ্রামের কোন্ পাড়া থেকে সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে, গ্রামের নক্সায় তা দেখিয়ে দেবেন। সে পাড়ার অধিবাসীরা কোন্ শ্রেণীর লোক?

১৩৩। গ্রামে চিকিৎসার ব্যবস্থা কি? হাতুড়ে ডাক্তার ক'জন? কবিরাজ ক'জন? কলেজ পাশকরা ডাক্তার? চিকিৎসকদের পারিশ্রমিকের হার কত? দাতব্য চিকিৎসালয় আছে কি? কত দূরে?

১৩৪। গ্রামে ধাত্রী আছে কিনা?

১৩৫। পানীয় জলের ব্যবস্থা কি? জলাশয়গুলির অবস্থা?

১৩৬। জলকষ্ট কখন হয় কিনা? কত বছর অন্তর? প্রতি বছর? বছরের কোন্ কোন্ মাসে?

১৩৭। জেলাবোর্ডের দেওয়া পুকুর বা ইন্দারা কত? জমিদারের দেওয়া?

১৩৮। পাঁচ হইতে চৌদ্দ বৎসরের ছেলে কত জন গ্রামে আছে ?

১৩৯। সাত হইতে বার বয়সের মেয়ে কত জন আছে ?

১৪০। কত স্কুল, পাঠশালা ও মক্তব আছে ? কার কাছে কত অর্থ সাহায্য পাওয়া যায় ? টোল আছে ?

১৪১। কোন্ বিদ্যালয়ে কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় ?

১৪২। কোন্ বিদ্যালয়ে কত বয়সের কত ছাত্র ?

১৪৩। সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা কত বৎসর পড়ে ? গ্রামের বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করে ক'জন অন্যত্র পড়ছে ? কি পড়ছে ?

১৪৪। গ্রামের নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ? শিক্ষিতের সংখ্যা ?

১৪৫। কোন শ্রেণীর মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা অধিক ?

১৪৬। ছাত্রদের কত বেতন দিতে হয় ?

১৪৭। অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা আছে কি না ?

১৪৮। শিল্প-শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা ?

১৪৯। শিক্ষিত লোকের মধ্যে শতকরা ক'জন গ্রামেই বাস করেন ? তাদের জীবিকা কি ?

১৫০। গ্রাম নিবাসী শিক্ষিত লোকেরা অন্যত্র কি ভাবে জীবিকার্জ্জন করেন ? ক'জন গ্রাজুয়েট এই গ্রামের ছাত্র ও গ্রামেই বাস করেন ?

১৫১। বালিকা বিদ্যালয় আছে কি না ?

১৫২। বাংলা পড়তে জানে স্ত্রীলোকদের মধ্যে সংখ্যা ক'জন ?

১৫৩। গ্রামে কথকতা, যাত্রা, কীর্ত্তন, পাচালী হয় কিনা ? এই সকল অনুষ্ঠানে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যোগ আছে কিনা ?

১৫৪। গ্রামে কোন পুস্তকালয় আছে কিনা ? কি ধরণের বই ? কারা পড়ে ? যুবকদের সভাসমিতি আছে কিনা ?

১৫৫। এই গ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি ? আপনি কি প্রস্তাব করেন ?

পল্লীর সামাজিক তথ্য—

১৫৬। অস্পৃশ্য জাত কারা এবং তাদের সংখ্যা কত ? গ্রামের কোন কোন পাড়ায় তারা বাস করে ? (নক্সায় কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়ে দেখিয়ে দেবেন)

১৫৭। বিভিন্ন জাতীর মধ্যে কোন ঐক্য সূত্র আছে কি না ?

১৫৮। "স্পৃশ্যদের" তুলনায় "অস্পৃশ্যদের" আর্থিক, শারীরিক নৈতিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় অবস্থা কিরূপ ?

১৫৯। গ্রামে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী লোক অধিক ?

১৬০। হরিসভা, হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, মুসলমানের দরগা প্রভৃতি আছে কিনা ? এই সভার সঙ্গে গ্রামের সম্বন্ধ কিরূপ ?

১৬১। মন্দিরের পুরোহিত ও ধর্ম্মসভার কর্ত্তা লেখাপড়া জানে কিনা ? ইহারা কি লোকশিক্ষার কোনো উদ্যোগে উৎসাহী ?

১৬২। গ্রামে কি কি বাৎসরিক উৎসবাদির আয়োজন করা হয় ?

১৬৩। গ্রামের সকল সম্প্রদায়ের সম্মিলিত উদ্যোগে কোনো প্রতিষ্ঠান গ্রামে আছে কিনা ? অতিথি সেবা, জলছত্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গ্রামে আছে কিনা ?

১৬৪। গ্রামের মেলা ও পূজা উপলক্ষে আমোদ প্রমোদের কি ব্যবস্থা আছে ? ব্যায়াম প্রদর্শনী হয় কিনা ?

১৬৫। হিন্দু বালিকাদের বিবাহের বয়স কত ? পণপ্রথা আছে ?

১৬৬। কোন্ শ্রেণীর মধ্যে কি পরিমাণ বরপণ ? কি পরিমাণ কন্যাপণ ? গ্রামের কোন বিষয় ব্যাপার নিয়ে দলাদলি আছে কি ?

গ্রাম্য শাসনব্যবস্থা—

১৬৭। ইউনিয়নবোর্ড আছে কি ?

১৬৮। স্থানিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্যাদি কিরূপ ?

১৬৯। শালিশী ব্যবস্থা আছে কিনা ? বিবাদ বিসম্বাদ কিভাবে মেটে ?

১৭০। মামলা মোকদ্দমার জন্য ঋণগ্রস্থ হইয়াছে এমন কত গৃহস্থ গ্রামে আছে ?

১৭১। গ্রামে ডাকাতি চুরি প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম কোন শ্রেণীর মধ্যে অধিক ?

১৭২। গ্রামে চৌকিদার কজন ? থানা কতদূর ?

১৭৩। গ্রামে 'মিলাড সরিফ' (মুসলমানদের শালিশী সভা) আছে কিনা ?

১৭৪। জমিদারী কাছারিতে বিচার হয় কিনা ? জমিদার কে ? তিনি পুণ্যাহ ও অন্য কোন অনুষ্ঠানোপলক্ষে তাঁর জমিদারী পরিদর্শনার্থ আসেন কি ?

১৭৫। জমিদার ও প্রজার সম্বন্ধ কিরূপ ? গ্রামের উন্নতির জন্য জমিদার কি কি কাজ করেছেন ?

১৭৬। এই গ্রামে ভোট দিতে পারে এমন কজন আছে ?

১৭৭। গ্রামে কংগ্রেস কমিটি আছে কি? সভ্য সংখ্যা?

১৭৮। মুসলমানের কোন সমিতি আছে কিনা? সভ্যসংখ্যা?

বিবিধ—

১৭৯। সর্পাঘাতে মৃত্যু কত? অন্যান্য জন্তুর আক্রমণে কত?

১৮০। আগুন প্রশমিত করবার ব্যবস্থা আছে কিনা?

১৮১। বর্ষাকালে প্লাবন হয় কি? কি পরিমাণ?

১৮২। গ্রামে মোট ক'খানি গরুর গাড়ী আছে?

১৮৩। নৌকো, ডিঙি, পান্‌সী কত আছে? মাঝিরা কোন্ শ্রেণীর লোক? অন্য প্রদেশের লোক?

১৮৪। গ্রামে তাড়ির দোকান আছে কিনা? মাসে আন্দাজ বিক্রী কত? কোন্ শ্রেণী বা জাতের মধ্যে তাড়ি বেশী প্রচলিত?

১৮৫। তাড়ি ভিন্ন অন্ন কিছু মাদক দ্রব্য বিক্রী হয় কিনা? কি কি ও ইহার পরিমাণ?

১৮৬। গ্রামে চোরের উপদ্রব আছে কিনা? ডাকাতি? খুন?

১৮৭। দেওয়ানী ও ফৌজদারী অপরাধে প্রতি বছর কত জন অভিযুক্ত হয়?

১৮৮। গ্রামের রাস্তার অবস্থা কিরূপ? বর্ষাকালে?

১৮৯। গ্রামে কোন্ কোন্ গাছ অধিক?

১৯০। গ্রামের কত গৃহস্থ কয়লা জ্বালে? গোবর (ঘুটে) জ্বালানি-রূপে কি পরিমাণ ব্যবহৃত হয়? কাঠ পাওয়া যায়? গ্রামে জ্বালানি কাঠের অভাব দূর করবার কোনো চেষ্টা আছে কিনা?

১৯১। কচুরীপানার (Water Hyacinth) উপদ্রব কবে থেকে সুরু হয়েছে? এই আগাছা নির্ম্মূল করবার জন্য কি কিছু করা হচ্ছে?

ঐতিহাসিক—

১৯২। গ্রামের প্রাচীন কোনো ইতিহাস আছে কিনা?

১৯৩। পুরাতন দেবালয়, বিগ্রহ বা অন্য কোনো প্রাচীন চিহ্ন আছে কিনা? থাক্‌লে তার বিবরণ।

১৯৪। গ্রামে কোনো স্বনামধন্য পুরুষ জন্মেছেন কি না?